দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০২১

আমাদের ভাষা

BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

Under Registered Charitable Trust

আমাদের ভাষা

দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০২১

BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION
GROUND FL., HOLDING NO.111/19, SARAT CHANDRA BISWAS RD.
KACHHARIPARA, BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
WEST BENGAL, PIN-743 411

Published by
BHSAA
(Basirhat High School Alumni Association)
under registered charitable Trust.

The views and opinions expressed in this book are of the authors and the facts are as reported by them, which have been verified to the extent possible, and the Trust or, the BHSAA, or, the editors are not in any way liable for the same.

All rights reserved.
© BHSAA 2021
No part of this publication may be reproduced without the prior permission.

Editors
Editorial Sub-Committee

Compilation
Shri Achintya Kumar Das

E-Magazine Design
Dr. Suptendu P. Biswas

Cover Design
Shri Rahul Sarkar

Printed by
M/s Dipak Computer Center
Registry Office More, Basirhat, North 24 Pgs

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১। সম্পাদকীয় - শ্রী বিশ্বমোহন দাস 1

২। শুভেচ্ছা - শ্রী অমলেন্দু প্রসাদ রায়, Chairman, Trustee Board (BHSAF) 2

৩। শুভেচ্ছা - শ্রী গৌতম দত্ত, সভাপতি, বসিরহাট হাই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি 3

৪। শুভেচ্ছা - শ্রী বিশ্বজিৎ মিস্ত্রি, টিচার-ইন-চার্জ, বসিরহাট হাই স্কুল 4

৫। শুভেচ্ছা - শ্রী তপন সরকার, পৌরপিতা, বসিরহাট পুরসভা 5

৬। From the BHSAA President's Desk- Shri Debajyoti Ray 6

৭। BHSAA সম্পাদকের প্রতিবেদন - শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য 10

।। শ্রদ্ধার্ঘ্য ।।

১। বিদ্যাসাগর ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব - শ্রী বিশ্বমোহন দাস 14

২। বসিরহাট হাইস্কুলের অন্যতম রূপকার ঃ আচার্য্য সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য - শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য 18

।। স্মৃতিচারণ ।।

১। স্কুলজীবনের কিছু স্মৃতি, কিছু কথা - শ্রী গোবিন্দ মল্লিক 21

২। আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় নীরেনবাবু - শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি 23

৩। A couple of dusted pages of history – Dr Suptendu P Biswas 24

।। শিক্ষা ।।

১। জীবনব্যাপী ও জীবনমুখী শিক্ষা - শ্রী দিব্যেন্দু সরকার 35

২। The Mould of our Mindset and ways to break through it - Shri Saugata Bhattacharyya 38

।। স্বাস্থ্য ।।

১। কোভিড ও শৈশব - ডাঃ মহুয়া সরকার 44

২। Reflection of a COVID pandemic year - Dr Shahedal Bari 47

৩। Cancer Prevention - Dr Tanmoy Mukhopadhyay 54

।। বাংলা কবিতা ।।

১। শ্রী মৃন্ময় সমীরণ নন্দী-র দুটি কবিতা 58
২। অবাস্তব - শ্রী মুরারি চক্রবর্তী 59
৩। উপলব্ধি - ডঃ অর্ঘ্য মজুমদার 59
৪। অপেক্ষায় আছি - শ্রী দেবাশীষ হোড় 60

।। ইংরাজী কবিতা ।।

১। My Neighbour - Shri Debajyoti Ray 61
২। Love birds- Dr Arghya Majumder 62

।। খেলাধুলা ।।

১। বসিরহাটের বরেণ্য ফুটবলাররা - শ্রী কালিদাস মজুমদার 63

।। অর্থনীতি ।।

১। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঃ কিছু ভাবনা - ডঃ অর্চিতা ঘোষ 70
২। বেসরকারীকরণ - কার স্বার্থে? - শ্রী মুরারি চক্রবর্ত্তী 72
৩। Significance of GST –Shri Gaurab Das 75

।। বিচিত্রা ।।

১। ইছামতীর বুকে : নদী উৎসব, নদী পর্যটন - শ্রী অরুণাভ দাস 79
২। শৈশবের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি - শ্রীমতী মুনমুন দাস 83
৩। করোনা ও আম্ফান পরবর্তী সুন্দরবন - শ্রী ইন্দ্রনীল বিশ্বাস 85

II About the Organization II

1. Awards 90
2. Trustee Board & BHSAA Committee 96
3. BHSAA Members 98

সম্পাদকীয়

২০২০। এক অভিশপ্ত বছর। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মৃত্যুর বিভীষিকা। কারণ Covid-19- এর সংক্রমণ। বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশি। ভারতে ১.৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের সংস্পর্শে এই মারাত্মক করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। একটা অতিমারী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংক্রমণ রুখতে দেশে তিনমাস লকডাউন চলল। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া অফিস কাছারি, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, সমস্ত দোকান পাঠ, পরিবহন সবই বন্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাল। জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে এল উম্ফুন (আমফান) ঝড়। ঝড়ের তাণ্ডবে দক্ষিণবঙ্গে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হল। অসংখ্য গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট উপড়ে পড়ল। বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটল। ফসলের খেত তছনছ হয়ে গেল। সরকারী ত্রাণের বন্টন বিভ্রাট দলীয় সংকীর্ণতায়। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতসেবাশ্রম সংঘের মত বহু প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন বিপন্ন মানুষের কাছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান বসিরহাট হাইস্কুল এ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন (BHSAA) করোনার ভয়কে উপেক্ষা করে সামর্থ্য মত ত্রাণ বিতরণ করেছে।

এমনি একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে BHSAA-র বার্ষিক মুখপত্র ''আমাদের ভাষা'' প্রকাশিত হল। তবে এ বছর e-magazine প্রকাশ করা হল। কারণ আমাদের বহু সদস্য কর্মসূত্রে দেশে বিদেশে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের এবার পত্রিকা হাতে পেতে সুবিধা হবে। নানা প্রয়োজনে পত্রিকার কিছু হার্ড কপিও প্রকাশ করা হয়েছে। যদি অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে - তাহলে পাঠকবর্গ নিজগুণে ক্ষমা করবেন এবং সুপরামর্শ দিয়ে ত্রুটি সংশোধনে আমাদের সহযোগিতা করবেন, আশা রাখি। যাঁরা লেখা দিয়েছেন এবং যাঁরা e-magazine প্রকাশে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যেসব সদস্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে BHSAA কে আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। BHSAA-র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন ও আনন্দে থাকুন।

শুভেচ্ছা

শ্রী অমলেন্দু প্রসাদ রায়

Trustee Board (Basirhat High School Alumni Foundation)-এর চেয়ারম্যান হিসাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রথম বর্ষের ন্যায় দ্বিতীয় বর্ষেও আমাদের সংগঠন তার মুখপত্র ''আমাদের ভাষা'' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে। আমি তার সাফল্য কামনা করি।

এ বছরের (২০২০) শুরু থেকে মনুষ্যবাহিত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বজুড়ে চলেছে মৃত্যুর মিছিল। করোনা ভাইরাসকে নির্মূল করার জন্য বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ্‌গণ ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। করোনার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশে দেশে নানা সময়ে লকডাউন ঘোষিত হয়েছে। আমাদের দেশ ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও তিনমাস লকডাউন ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এর উপর আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে আমফান ঝড়ে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। মানুষের সীমাহীন দুর্দশা।

আমাদের Alumni Association-এর সদস্যরা অতিমারী পরিস্থিতিতেও দুর্গম সুন্দরবন অঞ্চলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলের দুঃস্থ ছাত্রদেরকেও ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংগঠন স্কুলের মাঠের উত্তর দিক বরাবর পার্মানেন্ট ফেন্‌সিং তৈরি করে দিয়েছে। এটি স্কুলের উন্নয়নে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। এই ভাবে Alumni Association বছরভর তার কর্মযজ্ঞ চালিয়ে গিয়েছে। এ জন্য সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের সংগঠন স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এইভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করুক - এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

Index No. – B3-014
Institution Code – 103054

S.T.D. – 03217
Phone – 265-205

BASIRHAT HIGH SCHOOL
(HIGHER SECONDARY)

BASIRHAT ● NORTH 24 PARGANAS
E-mail : basirhathighschool@gmail.com

Ref. No......................

Date ২৪/১১/২০২০

শুভেচ্ছাবার্তা

বসিরহাট হাই স্কুল প্রাক্তনী ছাত্র সংসদ (B.H.S.A.A.) তাদের ২য় সাময়িকী প্রকাশ করতে চলেছে জেনে খুবই খুশি হলাম। সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। প্রতি বছর এই সংগঠন বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্ব দিকের প্রাচীর "ফেন্সিং" এর কাজ সম্পূর্ণ করেছে, এটি একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ এবং ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে অন্যান্য গঠন-মূলক উন্নয়ন মূলক কাজে এই সংগঠন এগিয়ে আসবে এবং তাদের উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে, এই প্রত্যাশায়, সংগঠনের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করলাম।

(Signature)

President
School Management Committee
BASIRHAT HIGH SCHOOL (H.S.)
Basirhat, North 24 Parganas

Index No. – B3-014
Institution Code – 103054

S.T.D. – 03217
Phone – 265-205

BASIRHAT HIGH SCHOOL
(HIGHER SECONDARY)
BASIRHAT ● NORTH 24 PARGANAS
E-mail : basirhathighschool@gmail.com

Ref. No.....

Date. 13.11.2020

শুভেচ্ছাবার্তা

বসিরহাট হাইস্কুলের প্রাক্তনী সংসদ (B.H.S.A.A) প্রেরনার অগ্রদূত। সারাবছর তারা নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেমন ভাবে বিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করেছে, আশারাখি অনুরুপ ভাবে ভাষা পত্রিকাও আমাদের নীরস ক্ষেত্রকে সতত সরস ও উর্বর করবে।

ভাষা পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

13.11.2020

শ্রী বিশ্বজিৎ মিস্ত্রি
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
বসিরহাট হাইস্কুল (উঃমাঃ)
উত্তর ২৪ পরগনা

Basirhat High School (Higher Secondary) ESTD.-1877 Basirhat, 24 Parganas(N)

TIC & Assistant Headmaster
Basirhat High School (HS)
North 24 Parganas

Phone :- 265-316 & 265-224

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS, BASIRHAT MUNICIPALITY

From : *Tapan Kumar Sarkar*
CHAIRPERSON
BOARD OF ADMINISTRATORS
BASIRHAT MUNICIPALITY

Sarat Biswas Road
Basirhat, North 24 Parganas
Ph :- 9434344377

Ref. No.....

Date. 12/11/2021

শুভেচ্ছা

আমাদের বসিরহাট হাইস্কুল অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েসনের ২য় বর্ষের স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে শুনে খুব আনন্দ পেলাম। বসিরহাট হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং B.H.S.A.A-এর একজন সদস্য হিসাবে যে কোন ভালো কাজেই আমার সমর্থন রয়েছে। এ বছর আমাদের কাছে মোটেই শুভ নয়। অতিমারী, আমফান আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও বিগত বছরে বেশ কিছু জনসেবামূলক কাজ, বৃক্ষরোপণ আমাদের সংগঠন করেছে। নিজস্ব ব্যস্ততা থাকায় আমি সবসময় হয়তো উপস্থিত থাকতে পারি না, কিন্তু মানসিক ভাবে আমি সবসময় এই সংগঠনের সঙ্গে আছি। আগামীদিনে আমরা বসিরহাট হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণকর্মে এবং সমাজের প্রয়োজনে আরো অনেক ভালো কাজ করতে পারবো, এই বিশ্বাস আমার আছে।

শুভেচ্ছান্তে
শ্রী তপন কুমার সরকার
চেয়ারপার্সন
বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস
বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটি

from THE BHSAA PRESIDENT'S DESK

Our beloved Alumni Association, BHSAA has completed the second year of its tenure and on this occasion I am glad to greet all our dear Members, through this second edition of our magazine. The first year-- 2019, though we were in the nascent stage, has been quite fruitful, in terms of our performance. We kick-started our first major programme on the 19th January '19, to commemorate the "Birth Centenary" of our Ex-Head Master, Late Jyotirindra Nath Das, which was well-attended by, among others, his family members. Speakers respectfully remembered his commitment and hard work for the development of our school, besides his special interest in planting a good number of trees in and around the school premises. Our Association utilised the occasion to award cash prizes of RS. 3,000/ each to the first three ranked students among the total schools in Basirhat Municipality, in their Secondary and Higher Secondary Examinations of 2018, as a gesture of our encouragement.

BHS students at the Planting Drive event

Our next programme --- "Planting of Trees" --- was held in July '19, and we achieved our target of planting 100 trees, mainly in and around the school premises/ ground. A good number of the school students and teachers took part in the programme, in addition to our Members. We were happy to contribute towards the environmental well-being.

'দুর্গাদাস বসু' - স্মারক প্রদান

The third major event was held on 14th September,'19, with the title: "Acharya Pronam", to pay obeisance to one of our most revered teachers, Late Durgadas Basu, which attracted a sizeable audience. Speakers recalled with deep respect, certain sterling qualities in him, both as a teacher and a good human being, with his lofty principle of "simple living and high thinking". A few of our Members staying outstation/ abroad, sent their messages through audio-visual mode, which were warmly appreciated. On this occasion too, we gave away cash awards of RS. 4,000/ each to the first three rankers among all schools in the Municipality, in their Secondary and Higher Secondary Examinations of 2019. In addition, a one-time cash award of RS. 5,000/ was given to a poor, meritorious student of our school, based on his good performance in the H.S. Examination. A Special cash award, viz. "Durgadas Basu Memorial Award" of RS. 4,000/ was instituted by one of our founder members from his funds, for our school student having highest aggregate score in English and Bengali, in H.S. Examination.

The programme was embellished by a few extra-curricular creative events for the school students, viz. (1) Poster Painting Competition, (2) English and Bengali Essay writing Competition, (3) Debate Competition and (4) "SPELL BEE" -- Spelling Competition. The last one, a maiden venture in Basirhat, was held with participation by teams of two students each from the

prominent schools in the Municipality. Conducted efficiently through audio-visual method, the event was an instant success, generating as it did, considerable interest in the participants as well as the audience. The winners of all the above competitive events were duly awarded.

The current year - 2020 will go down in history as a landmark year, afflicted as it has been, with "Corona Pandemic" world-wide. Though all of us were 'locked down' ever since March, our Association has, thanks to the exceptional zeal of our committed Members, successfully held a few major programmes, maintaining standard safety protocols.

As all of us are aware, the pandemic severely affected the lives of the poor all over. In a modest way, to fulfill our social obligation, we selected 130 needy, deserving families, mainly related to our school students and some others in the surrounding area, and gave away packets of food/ provisions as instant succour. In the same way, following the "Amphan" cyclone and the devastation it left on the lives of the poor, we ventured into our next programme --- providing food, clothes, essential provisions, to a good number of poor families in the far away Sunderbans. In this noble mission, we got valuable assistance from "Sarada Math and Mission"'s monks and volunteers. We owe to them our humble gratitude.

Despite severe handicaps, we have also fulfilled our commitment to environmental welfare, by planting a good number of saplings in and around our school ground. It's a pleasure today, when we see the kid plants of the last year, have grown into strong adults. As a gesture of our support, we have given a sum of RS. 25,000/ to the bereaved family of an ex-student of our school, a promising footballer, who died at a pre-mature age.

Finally, our most prominent work has been -- "Fencing the open area at the Northern end of our School ground". The work, started in 2019 in response to our School Authority's desire, has since been completed. We have also planted saplings inside the covered area, as a measure of beautification. We feel this work will stand as a lasting testimony to BHSAA's contribution for the welfare of our Alma mater.

At the end, a word of regret! One very relevant programme during the lockdown period for benefit of the students, viz. "Virtual Class Teaching" could not materialise. Though, with all sincere efforts, BHSAA members

helped creation of the platform and the method, the project could not be implemented, for reasons beyond our control. In future, however, we shall be glad to help, when called upon.

অরুণ কুমার বসু স্মৃতি প্রাঙ্গণের শুভ উদ্বোধন - 8th Jan, 2021

Overall, it has been a year of good performance, despite such a disaster. No words are adequate to thank our Members who worked hard and sincerely to make the programmes successful. They deserve our sincere appreciation and compliments. I also thank the School Management for their valuable support and cooperation in all our endeavours. We hope to continue our good work in the days to come.

In the end, with a heavy heart, we condole the untimely demise of our Head Master, Swapan K. Roy, who always stood by the activities of BHSAA with positivity. May his soul rest in peace!!!

Best wishes to all our dear members.

BHSAA

সম্পাদকের প্রতিবেদন

দেখতে দেখতে BHSAA বা Basirhat High School Alumni Association ২য় বর্ষ অতিক্রম করল। গতবারের প্রতিবেদনে বলেছিলাম 'BHSAA' একটি স্বপ্নপূরণের নাম। বিগত দুবছরে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় সেই স্বপ্নপূরণের পথে আমরা যাত্রা শুরু করতে পেরেছি।

প্রথম বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ বছর মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ নামক অতিমারী আমাদের তথা সারা পৃথিবীর জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়ে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের দেশে বহু লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিগত বছরে আমরা হারিয়েছি অনেক প্রিয় মানুষকে। সকলের কথা এখানে আলোচ্য না হলেও একজনের কথা এখানে বলতেই হয়। তিনি আর কেউ নন, আমাদের স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী স্বপন কুমার রায়। যাঁর অকাল প্রয়াণ আমাদের শোকস্তব্ধ করেছে। কিছুদিন আগে আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ও অন্যতম সদস্য, একসময়ের বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বিশ্বনাথদা (দে) অকালে প্রয়াত হয়েছেন। আমরা মর্মাহত। আমি এঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিগত নয় মাসে হঠাৎ থমকে যাওয়া জীবনের ধারা, আতঙ্কের বাতাবরণের মধ্যেও আমাদের BHSAA কিন্তু থেমে থাকেনি। করোনা পরিস্থিতি উদ্ভবের পর যখন দেশব্যাপী লকডাউন চলছে, অসংখ্য 'দিন আনা দিন খাওয়া' মানুষ কর্মহীন, চতুর্দিকে খাদ্যের হাহাকার তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম স্কুলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং অবশ্যই স্কুলের দুঃস্থ ছাত্রদের পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে আমরা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করব। সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমরা আমাদের স্থানীয় সদস্যদের সহযোগিতায় ১৩০টি পরিবারকে চিহ্নিত করে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে স্কুল থেকেই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি।

এরপরই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত' আসে আম্ফান ঝড়ের তাণ্ডব। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে শুরু করে। আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরাও কিছু করব। সদস্যরা আবেদনে সাড়া দিলেন। প্রচুর জামাকাপড় সংগৃহীত হল সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও শুকনো খাবারের প্যাকেট নেওয়া হল। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল 'সারদা মঠ ও মিশন'। আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সান্ডেলেরবিল রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে। ৪ঠা জুন আমরা দুটি ছোট ট্রাকে জিনিসপত্র নিয়ে 'সান্ডেলেরবিল' মিশনে পৌছাই। সেখান থেকে আমরা ভটভটি যোগে দুলদুলি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১নং সাহেবখালি ব্লকে যাই। মিশনের মহারাজ ও স্বেচ্ছাসেবীদের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আমরা নিজ হাতে ২৪১টি পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করি। এই কাজের মধ্য দিয়ে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজের বুকে আমাদের কর্মকাণ্ডের পরিচয় আমরা রাখতে পেরেছি। গত বছর স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করেছিলাম। অতিমারীর মধ্যেই এবছর আমরা কলকাতার 'খুশী' সংস্থার (যোগাযোগ মাধ্যম - মিহির বসু) সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করেছি।

অনুষ্ঠান শেষে প্রাক্তনীরা

আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা এ বছর করেছি। আমাদের স্কুলমাঠের উত্তরদিকের অরুণ বসু সরণি বরাবর বিস্তীর্ণ অংশ উন্মুক্ত থাকায় বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা চাওয়ায় আমরা প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে পিলার ও পাইপ সহযোগে জায়গাটা ঘিরে দিয়েছি এবং অব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষরোপণ করে সুরক্ষিত ও সুশোভিত করেছি। এটাই আমার মতে BHSAA -এর অন্যতম চিরস্থায়ী কাজ। যতদিন এই ফেন্সিং থাকবে তা BHSAA -এর সদস্যদের কাজের স্মৃতিচিহ্ন বহন করবে। BHSAA-র সদস্যগণের এবং স্কুল-কর্তৃপক্ষের সহমতের ভিত্তিতে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ˚অরুণ কুমার বসু মহাশয়ের নামে প্রাঙ্গনটির নামকরণ করা হয় 'অরুণ কুমার বসু স্মৃতি প্রাঙ্গণ'। গত ৮ই জানুয়ারী, ২০২১ BHSAA সদস্যগণের এবং স্কুল-কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে প্রাঙ্গণটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

সবশেষে আমি আমাদের পত্রিকা প্রসঙ্গে বলি। পত্রিকা সম্পাদক বিশ্বমোহন দাসের সুদক্ষ নেতৃত্বে এবছরও 'আমাদের ভাষা' প্রকাশিত হতে চলেছে। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সুদক্ষ, মননশীল সদস্যরা। প্রথমে ই-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে এবং পরে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হবে। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ছাত্র ও তরুণ সদস্য দেবাশীষ হোড়কে, যে একাহাতে সমস্ত হাতে লেখা পান্ডুলিপি কম্পিউটারে প্রায় নির্ভুল টাইপ করে অসাধ্য সাধন করেছে। ধন্যবাদ জানাই সেই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের যাঁরা এই অতিমারীর সময়ও আর্থিক সহায়তা করে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। আমাদের এ বছরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে সব সদস্য আর্থিক সহায়তা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সব সদস্যদের যাঁরা করোনা প্রকোপের মধ্যেও যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সামিল হয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে জানাই BHSAA -এর বর্তমান কার্যকরী সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সাধারণ সভায় নতুন কমিটি তৈরি হবে। কিন্তু সেটা একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র। BHSAA সকলের সহযোগিতায় আপন গতিতে এগিয়ে যাবে।

WE CONVEY OUR
HEARTFELT CONDOLENCE
FOR THE SAD AND
UNTIMELY DEMISE OF

SHRI SWAPAN KUMAR ROY
[1961-2020]
HEADMASTER
BASIRHAT HIGH SCHOOL

For a long time, he was associated with our school and contributed substantially to the progress of its academic and administrative affairs. In this, he endeared himself to his students and colleagues, both as a dedicated teacher and as a good human being, with friendly and courteous behaviour.

We shall always remember him for his committed association with the programmes and projects of BHSAA since its inception. We deeply mourn the loss, with his passing away.

May God shower peace and blessings on his departed soul and give strength to the bereaved family, to cope with the tragic loss, with fortitude.

MEMBERS
BASIRHAT HIGH SCHOOL
ALUMNI ASSOCIATION
30 SEPTEMBER | 2020

BHSAA

।। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

BHSAA -র অন্যতম সদস্য
বিশ্বনাথ দে মহাশয়ের
অকাল প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ ।

তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল ।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিদ্যাসাগর

এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

শ্রী বিশ্বমোহন দাস

উপহাসের পাত্র হব জেনেও ''প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুরিব বামনঃ''- সহজ কথায় বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্পর্ধা বা দুরাশা নিয়ে বিদ্যাসাগরের মত এক অনন্য ব্যক্তিত্বের কথা লিখতে বসেছি। পাঠকবর্গ আমাকে মার্জনা করবেন। তবে আমার একটা সুবিধা বা অসুবিধাও বলতে পারেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে শুরু করে অসংখ্য বিদগ্ধ ব্যক্তি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বহু কথা লিখেছেন। সুবিধা হল পুরনো গানের রিমেক করা আর অসুবিধা হল নতুন কি লিখবো তা ভেবে না পাওয়া। আসলে বিদ্যাসাগর এক লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্র অনুধাবন আমাদের মত সাধারণের অগম্য। সংস্কৃত কবি ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন-

''বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হসি।।''

কোমলতা ও কঠোরতার একত্র সমাবেশে মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে মনুষ্যত্বের এই পূর্ণতা লক্ষণীয়।

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড: সুকুমার সেন বিদ্যাসাগরকে 'আধুনিকতম মানুষ' আখ্যা দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত একেবারে up-to-date বলতে আড়াইজন মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন। ''একজন বিদ্যাসাগর, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ, আর অর্ধেক হলেন রামমোহন রায়। .....বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রগণ্য।'' সমাজ সংস্কারে বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ রদ ও বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনে, নারী শিক্ষার প্রসারে এবং সর্বপ্রকার যুক্তিহীন প্রথাগত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে অনমনীয় দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, জাত-পাত, কুসংস্কারে দীর্ণ সমাজের সমস্তরকম প্রতিকূলতার

বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবল আত্মশক্তি এবং পরের জন্য গভীর সহানুভূতি ও বেদনাবোধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে পরিবারের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে যাঁরা প্রবলভাবে স্বাধীনচেতা তাঁরা অনেকসময় এই পারিবারিক প্রভাবকে অতিক্রম করে যান। বিদ্যাসাগর এমনই একজন মানুষ ছিলেন। তবু তাঁর জীবনে পারিবারিক প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা ও স্বাধীনচেতা মানুষ।

বিদ্যাসাগর তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন- ''শকাব্দা ঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান।'' জন্মমুহূর্তে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে ছিলেন না। বীরসিংহ থেকে আধক্রোশ দূরে কোমরগঞ্জ গ্রামে হাট করতে গিয়েছিলেন। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ নাতির জন্মসংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন। পথে ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা- বললেন, ''একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।'' এই সময় বাড়িতে একটি গরুরও দু'একদিনের মধ্যে বাছুর হবার সম্ভাবনা ছিল। বাড়ি ফিরে ঠাকুরদাস বাছুরটি দেখার জন্য গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। রামজয় হাসিমুখে বললেন- 'ও দিক নয়, এদিকে এস।' এই বলে তাঁকে সূতিকাগৃহে নিয়ে গিয়ে এঁড়ে বাছুরটিকে দেখিয়ে দিলেন। পরিহাস করে বললেও পিতামহ রামজয়ের মন্তব্যটি আশৈশব বিদ্যাসাগরের জীবনে সর্বাংশে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এঁড়ে অর্থাৎ পুঙ্গব। বিদ্যাসাগর বীরসিংহের বীরপুঙ্গব। তাঁর ছিল পুঙ্গবের মত ভয়ঙ্কর জেদ। যে কাজে হাত দিতেন তা শেষ না করে তিনি ছাড়তেন না। 'বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণের এবং সমাজপতিদের প্রবল বাধা এমনকি তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তকেও নস্যাৎ করে এই আইন তিনি পাশ করিয়ে ছেড়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠার পথটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। বাবা ঠাকুরদাস কলকাতায় এক পরিবারে সামান্য খাতা লেখার কাজ করতেন। তিনি যে বেতন পেতেন তাতে সংসার চালান প্রায় দুরূহ ছিল। বিদ্যাসাগরও ঐ একই বাড়িতে থাকতেন। বাজার করা থেকে শুরু করে বাটনা বাটা, রান্না করা, বাসন মাজা সবই তাঁকে করতে হত। সংস্কৃত কলেজে যাওয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে গত রাতের পড়া বিষয়গুলির স্মরণ, মনন, নিধিধ্যাসনের কাজ চলত। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় আবার কিছু গৃহস্থালীর কাজ সারতে হত। স্বভাবতঃই ক্লান্তিতে দুচোখ জুড়িয়ে আসত। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তেন। বাবাকে বলতেন দু'ঘন্টা পরে ডেকে দিতে। বাবা তাঁকে দুঘন্টা পরেই ডেকে দিতেন। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা। যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন সেজন্য কখনো চোখে সরষের তেল ঘষতেন, কখনো মাথার টিকির সঙ্গে শক্ত দড়ি বেঁধে ঘরের কোনো খুঁটিতে দড়িটাকে বেঁধে দিতেন। ক্লাসে তিনি সবথেকে মেধাবী ছাত্র। বছর বছর পরীক্ষায় বৃত্তি পেতেন। সেই বৃত্তির টাকায় গরীবের সংসারে কিছুটা সুরাহা হত। বৃত্তির টাকায় সহপাঠীদের মাঝে মাঝে খাওয়াতেন। তাঁরাও যে বেশ গরীব ছিলেন। এইভাবে ছাত্রজীবনেই তাঁর অসামান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠছিল এবং কর্মজীবনে তা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল।

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিসেম্বর, ১৮৪১ তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের হেড পন্ডিত পদে যোগ দেন। তাঁর দায়িত্ব ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের বাংলা ও হিন্দি শেখানো। কিন্তু হিন্দি ও ইংরাজীতে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল না। তাই সুষ্ঠু ভাবে তিনি যাতে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য দুজন শিক্ষকের

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, যা বাঙালি চরিত্রে প্রায় দুর্লভ।

কাছে হিন্দি ও ইংরাজি শিখতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই দুটি ভাষাতেই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের দেশীয় ভাষা শেখার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তারা পরীক্ষায় বারবার ফেল করতে লাগল। কলেজের হায়ার অথরিটিজ বিদ্যাসাগরকে একটু সহজ করে (Leniently) পরীক্ষাপত্র মূল্যায়ন করতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর এই অনুরোধ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন এবং চাকরিতে ইস্তফা দিতে চান। হায়ার অথরিটিজ আর এমন অনুরোধ করেন নি। বিদ্যাসাগরও তাঁর কাজ চালিয়ে যান।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, যা বাঙালি চরিত্রে প্রায় দুর্লভ। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন। সে সময় কলেজে নিয়ম শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। বেশ কিছু শিক্ষক নিয়মিত দেরিতে আসেন। কেউ কেউ আবার ক্লাসের মধ্যেই ভাত ঘুমটা সেরে নেন। তাঁর মধ্যে অনেকে আবার বিদ্যাসাগরের নিজেরই শিক্ষক। বিদ্যাসাগর খুবই বিব্রত। কলেজে নিয়ম শৃঙ্খলা ফেরানো খুবই জরুরি। শিক্ষকদের প্রতি এতটুকু কঠোর না হয়েও কলেজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই তিনি কলেজ শুরুর ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলেন। দেরিতে আসা শিক্ষকদের তিনি মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁরা লজ্জায় আর দেরি করেন না, সময়ে আসতে লাগলেন। ক্লাস শুরু হলে তিনি প্রায়ই রাউন্ড দিতে লাগলেন। অচিরেই কলেজে শৃঙ্খলা ফিরে এল।

বিদ্যাসাগরের প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল তাঁর আপামর মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। এই ভালোবাসা থেকেই তাঁর যাবতীয় সংস্কার কার্য। তিনি অনুভব করেছিলেন নারী পুরুষ গ্রাম শহর সর্বস্তরে শিক্ষার সার্বিক প্রসার না ঘটলে মানুষের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি একাই পঁয়ত্রিশটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মধ্যে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। এটা সম্ভবতঃ সর্বকালীন রেকর্ড। এইসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে কখনও নৌকায়, কখনও পালকিতে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনো বা মাইলের পর মাইল চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছে। শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠাই নয়, সংস্কৃত কলেজে টীচার্স ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং তা কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ''বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।'' তিনি ''বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।'' স্বাভাবিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও বিদ্যাসাগরের তৈরি গদ্য কাঠামোকে আমরা অনুসরণ করে থাকি।

আমরা বলি বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, করুণার সাগর। কিন্তু ''তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনা মাত্র নহে, তাঁহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।''.....(রবীন্দ্রনাথ)। রাধারমণ মিত্র একটা হিসাব দিয়েছেন, বিদ্যাসাগর গরীবের দুঃখ মোচনে, শিক্ষার প্রসারে এবং বিধবা বিবাহের কারণে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই টাকার অংকটা কিছু কম ছিল না। মৃত্যুকালে অনেকটাই ঋণ থেকে গিয়েছিল। একটা উইলে তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যতক্ষণ সমস্ত ঋণ পরিশোধ না হচ্ছে ততক্ষণ সন্তানাদি তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না।

অবিভক্ত বাংলায় সেদিন এমন কোন মানুষ ছিলেন না যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী ছিলেন না। আজও আমরা তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেদিন যাঁরা তাঁর দ্বারা কোন না কোনভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের অকৃতজ্ঞতা, শঠতা এমনকি প্রতারণা এবং তথাকথিত ভদ্রলোকদের দ্বিচারিতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি শেষ জীবনে আত্মীয় পরিজন ছেড়ে শহুরে ভদ্রসমাজ ত্যাগ করে সুদূর সাঁওতাল পরগণার কর্মাটাড়ে গিয়ে অশিক্ষিত, হতদরিদ্র, নিরন্ন, বুভুক্ষু, সহজ, সরল আদিবাসীদের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্যাসাগর কর্মাটাড় স্টেশনের (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর স্টেশন) কাছে একটা বাংলো বাড়িতে থাকতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম যৌবনে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে যোগ দিতে চলেছেন। পথে কর্মাটাড়ে একদিনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন একের পর এক সাঁওতাল নারী পুরুষ কিছু কিছু ভুট্টা নিয়ে আসছেন, আর যে যা দাম চাইছেন সেই দামেই বিদ্যাসাগর ভুট্টা কিনছেন। সকাল ৮টার মধ্যে ঘরের সমস্ত তাক ভুট্টায় ভরে গেল। তবু ভুট্টা কেনার বিরাম নেই। কৌতূহলী হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন- এতো ভুট্টা কি হবে ? বিদ্যাসাগর বললেন, দেখবি রে, দেখবি। বেলা বাড়তে না বাড়তেই দেখা গেল বাংলোর সামনের উঠোন সাঁওতাল নারী পুরুষ ছেলে বুড়োতে ভরে গেল। তারা পাঁচ থেকে দশজনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উঠোনে বসল। প্রত্যেক দলের মাঝখানে শুকনো পাতা ও কাঠ জড়ো করা। বিদ্যাসাগরকে দেখেই তারা বলে উঠল- ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর তাদের চাহিদা মত ভুট্টা পরিবেশন করলেন। তারা আগুনে পুড়িয়ে ভুট্টা খেল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরিয়ে এল। খেয়ে উঠে তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলল- বিদ্যেসাগর, খুব খাইয়েছিস। এই দৃশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিজের চোখে দেখা।

চারিত্রিক দৃঢ়তায় কর্মযোগী বিদ্যাসাগর মহত্ত্বের সর্বোন্নত শিখরে আরোহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয় মানবপ্রেম জগতের আদর্শ স্বরূপ। তাঁর দ্বিশততম জন্মবর্ষে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি-

হে বিদ্যাসাগর, তুমি জীবন পথের এক অক্লান্ত পথিক। তোমার চলার পথ ছিল জাতপাত-স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কারে দীর্ণ ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদে কণ্টকিত। প্রবল মানসিক দৃঢ়তায় সেই কণ্টককে দুপায়ে দলিত করে আজীবন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছ। আপামর মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে উৎসারিত তোমার অপার মানবহিতৈষণা। জাতির পাথর-প্রমাণ জড়ত্বকে চূর্ণ করতে তুমি প্রবল আঘাত হেনেছ। তমসাচ্ছন্ন বাংলার মাটিতে আধুনিক শিক্ষার যে প্রদীপ তুমি জ্বালিয়েছিলে আজও তা দেদীপ্যমান। সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে তুমি মানব মুক্তির পথ দেখিয়েছিলে। তুমি শুধু অগ্রণী পথিক নও, তুমি জাতির পথ-প্রদর্শক। তুমি বাংলার নবজাগরণের দিশারী। তোমার উপমা একমাত্র তুমিই। হে প্রাতঃস্মরণীয়, তোমাকে আমার বিনম্র প্রণাম।

> ''একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, - অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়-শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, - অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দুধর্মের গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিগের মত, - অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জ্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ, - অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।''
>
> - রমেশচন্দ্র দত্ত ।

বসিরহাট হাইস্কুলের অন্যতম রূপকার
আচার্য্য সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(জন্ম- ৯ই আগষ্ট, ১৮৮৪; মৃত্যু- ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৪
শিক্ষকতাকাল: ১৯১২-১৯৫৩)

শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য

ঐতিহ্যবাহী বসিরহাট হাইস্কুলের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বেশ কয়েকজন শিক্ষকমহাশয় ও প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের অবদানকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না। প্রধান শিক্ষকরা হলেন বিদ্যালয়ের কাণ্ডারী, যাঁদের সুনিপুণ পরিচালনায় ও দূরদৃষ্টিতে একটি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। বসিরহাট হাইস্কুলের উত্থানের পিছনে অনেকের মধ্যে যিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি আচার্য্য সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ঋষিতুল্য এই মানুষটি তাঁর জীবনভোর এই বিদ্যালয়ের উন্নতির কথা চিন্তা করে গিয়েছেন। পারিবারিক জীবনে অসংখ্য দুঃখ কষ্টকে তিনি অবলীলায় জয় করেছেন। ধলতিথা গ্রামে ভট্টাচার্য্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ, মধ্যবয়সে স্ত্রীবিয়োগ, একাধিক পুত্রশোক, মাত্র এগারো দিনের শিশুসন্তান নিয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি ছিলেন হিমালয়সদৃশ অনড়, অটল। কোন বিপর্যয়ই তাঁকে কর্তব্য কর্ম থেকে টলাতে পারেনি। বিদ্যালয়ই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

বসিরহাট হাইস্কুলের স্বর্ণযুগের সূচনা সেই সময়, যে সময়ে সতীশবাবু ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ পাল। দুজনেই ব্যক্তিত্ববান। শুধু একটি পার্থক্য। ব্যক্তিত্বের জ্যোতি একজনের ক্ষেত্রে তীব্র, প্রখর; অন্যজনের ক্ষেত্রে শান্ত, স্নিগ্ধ। সতীশবাবুকে কখনও বেত্রশাসন করতে হয়নি, তাঁর নেত্রশাসনই যথেষ্ট ছিল। কোন ক্লাসরুমে ছাত্রদের কলরব থামাবার জন্য পাশের ঘরে সতীশবাবুর উপস্থিতির সংবাদই ছিল যথেষ্ট। সেই সময়কার দুষ্টু ছেলেরা 'সতীশবাবুকে' কী চোখে দেখতো? কিছু মজার ছড়া সেই সময় প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে একটিকে বলা যায় 'মাস্টার কাহিনি'। যথা-

হেড্‌মাষ্টারের লম্বা ভুঁড়ি।
সতীশবাবুর চশমা-জুড়ি।
থার্ডমাষ্টার টলম্যান।
বিনয়বাবু বুদ্ধিমান। --ইত্যাদি।

আর একটি ছড়ার মধ্যেও যথেষ্ট রিয়েলিজম্ ছিল। এটাকে স্কুলকাহিনি বলা যেতে পারে। যথা-

ফার্স্ট ক্লাস খায় বিড়ি।
সেকেন্ড ক্লাসে গলায় দড়ি।
থার্ড ক্লাসে পড়ে জল।
ফোর্থ ক্লাসে গুন্ডোর দল।
ফিফথ্ ক্লাসে ফুলের সৌরভ।

সিকস্থ্ ক্লাসে কলরব।
সেভেন্থ্ ক্লাসে লোহার কড়ি।
সেভেন্থ্-বি-তে ভূতের বাড়ি।

শ্রদ্ধেয় নগেনবাবুর পর প্রধান শিক্ষক হন 'আচার্য্য সতীশচন্দ্র'। বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে এই সময় তিনি জীবনপণ করেন। 'সতীশবাবুর' ইংরাজী এইসময় মহকুমার উচ্চশিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। 'Grammarian' বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একথা ঠিক বহু তথাকথিত ইংরাজী জানা মানুষও তাকে সমীহ করতেন নিজেদের ইংরাজী-দৈন্য ধরা পড়ার ভয়ে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি বিচিত্রার পরিচালনার সময় 'সতীশবাবুকে' যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। কাব্যের আবৃত্তিতে সুরযোজনায় তাঁর মৌলিকতা ও উৎকর্ষ অভিনন্দিত হয়েছে রসিক মহলে। সংস্কৃতে তো কথাই নেই, এমনকি উর্দু গানের সুরারোপেও তদানীন্তন মৌলবীসাহেব 'সতীশবাবুর' সাথে পরামর্শ করতেন এবং ''তামাম্ আলামনে হামনে দেখা/ উন্হিকা জলওয়া চমক্ রহা হ্যায়।'' (সম্পূর্ণ বিশ্বে আমি দেখি তাঁরই দীপ্তির প্রকাশ) - এই উর্দু সংগীতটিকে ঠিক সংস্কৃত স্তবের মতই গাইতে শোনা গেছে 'সতীশবাবুকে'। 'ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়'- এটাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

বসিরহাট হাইস্কুলের উন্নতির জন্য অজস্র কর্মকাণ্ডের কয়েকটি কথা উল্লেখ না করলে 'আচার্য্য সতীশচন্দ্রবাবুর' সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সেই সময় সরকারী আর্থিক আনুকূল্য লাভ সম্ভব ছিল না। ছাত্রদের মাসিক বেতন দিয়েই পড়তে হত। এই অবস্থাতেও ছাত্রদরদী 'সতীশবাবু' দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রদের ফি মুকুব বা অর্ধবেতনের ব্যবস্থা করতেন। প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে বেতন দিয়ে দিতেন, বই কিনে দিতেন। নিজে স্কুলের শেষে অতিরিক্ত কোচিং করাতেন। অনেক সময় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বসিরহাটের কোন ধনী পরিবারে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও ছাত্রদরদী হৃদয়ের জন্য এইসব ব্যক্তিরা পরম শ্রদ্ধায় সাহায্যের হাত বাড়াতেন।

> সপ্তাহে একবার ইংরাজীতে বিতর্ক সভার ক্লাসের আয়োজন করতেন। বিষয়বস্তু তিনি ঠিক করে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের ইংরাজী বলায় সড়গড় করে তোলা এবং মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটানো।

তাঁর অসাধারণ চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের আর একটি উদাহরণ হল ১৯৩৯ সালে বসিরহাট হাইস্কুলে প্রথম মহকুমার মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সেন্টার আদায় করা। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্ট্রোলার অব একজামিনেশন' ছিলেন শ্রী বি.বি. দত্ত মহাশয় এবং 'রেজিস্ট্রার' ছিলেন শ্রী জে. চৌধুরী মহাশয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বারংবার যাতায়াত করে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান এবং এর ফলে শুধু বসিরহাট হাইস্কুল নয়, এলাকার অন্য স্কুলের ছাত্ররাও উপকৃত হয়। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। প্রথমে নাম ছিল ''বসিরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্র''। পরে 'সতীশবাবুই' এর নামকরণ করেন 'ভারতী'। প্রতিটি লেখার উপরই তাঁর কলম চলত নির্ভুল প্রকাশনার জন্য। খেলাধূলার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। বসিরহাট স্কুলের খেলাধূলার মানোন্নয়নের দিকেও ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর।

ঋষিতুল্য দূরদর্শী মানুষটি উপলব্ধি করেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে স্কুলের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়বে এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং স্কুল বিল্ডিং-এর সংস্কার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে একটি হলঘরের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এরপরই শুরু হল তাঁর লক্ষ্যে পৌছানোর কঠোর সংগ্রাম। প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ করা শুরু হল এবং ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি একক প্রচেষ্টায় তিনি ৩৪,০০০/- হাজার টাকা

(আজকের অর্থমূল্যে বিচার করলে কত হতে পারে তা পাঠকদের বিবেচনাধীন) সংগ্রহ করেন। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁকে মাঝেমাঝেই কলকাতায় যেতে হত। তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, ফলে পথি মধ্যে প্রায়ই অভুক্ত থাকতেন। এর ফলস্বরূপ সেইসময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে আবার অভীষ্ট লক্ষ্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। এই সময় তিনি 'H'-type স্কুল বিল্ডিং-এর পরিকল্পনা করেন, যার মধ্যিখানে থাকবে 'হলঘর'। কিন্তু প্রয়োজন আরও অর্থের। তিনি চিঠি লিখলেন শ্রী ডি. এম. সেনকে (The Then Director of Public Instruction, W.B.) এবং বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন তাঁর পরিকল্পিত স্কুল বিল্ডিং রূপায়ণে আর্থিক সহায়তার জন্য। তাঁর এই চিঠি এতই সুন্দর ছিল যে তার বিষয়বস্তু শ্রীসেনের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে 'লক্ষাধিক' টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেন। আজকের স্কুল বিল্ডিংয়ের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তা 'আচার্য্য সতীশচন্দ্রের' অসাধারণ কর্মকাণ্ডের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সেই সময় এই কাজে সহকর্মীদের মধ্যে যে দুজন তাঁকে অক্লান্তভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন, তাঁরা হলেন 'প্রয়াত প্রাণকুমার রায় মহাশয়' এবং 'প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস মহাশয়।

'আচার্য্য সতীশচন্দ্র' তাঁর এই বিপুল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭২ সালে 'জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ শাখা' কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। সরকারি সম্মান লাভের পর তদানীন্তন প্রাক্তন ছাত্ররা স্কুলে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আশীর্ব্বাণী হিসাবে তিনি যা বলেছিলেন আমি তার সামান্য অংশ তুলে ধরলাম। ---'চরিত্র মানব জীবনের মেরুদণ্ড এবং মানদণ্ড; সেই চরিত্রগঠনই প্রকৃত শিক্ষা এবং যথাযথভাবে রক্ষা করাই জীবনব্যাপী কর্তব্য।'--- "A galaxy of luminaries, shining in your respective orbs, you have taken the trouble to gravitate, this afternoon, to your old school to pay respect to your superannuated teacher tottering in the closing years of his uneventful life. God bless you.

যাঁর হাত দিয়ে এতবড় কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে, সেই নিরহংকার, প্রচারবিমুখ মানুষটি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছেন। বেশীরভাগ মানুষই ভুলে গিয়েছেন তাঁর অসামান্য অবদানকে। আসলে তাঁর হয়ে প্রচার করার লোকও আজ খুব কমই বেঁচে আছেন। ছিল না তাঁর কোন রাজনৈতিক মোড়কও। হয়তো সেই কারণেই আজকের এই রাজনীতিসর্বস্ব যুগে তিনি কিছুটা হলেও অবহেলিত - উপেক্ষিত। তবুও ইতিহাসকে কখনও মুছে ফেলা যায়না। তাই তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করতেই আমার এই সামান্য প্রয়াস। স্বকীয় মহিমায় 'আচার্য্য সতীশচন্দ্র' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সম্পর্কে সামান্য কিছু লিখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তথ্যসূত্র ঋণস্বীকার: ১। শিক্ষাচার্য্য সতীশচন্দ্রের জীবনচিত্র ও চরিত্র সংকেত - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
২। A Respectful homage to the late lamented and most-revered Retired Headmaster Satish Ch. Bhattacharya - An Ex-pupil Kaliprosad Bhattacharya (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত)
৩। Late Krishnaprosad Bhattacharya

স্মৃতিচারণ

স্কুলজীবনের কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

শ্রী গোবিন্দ মল্লিক

'বসিরহাট হাই স্কুল' নামটার সাথে আমাদের সকলের ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ মধ্য ষাটে দাঁড়িয়ে যখন একা বসে থাকি, তখন স্কুল জীবনের অনেক পুরোনো কথা মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। বসিরহাট হাই স্কুলে আমার স্কুল জীবন শুরু পঞ্চম শ্রেণী থেকে। এর আগে ক্লাস ফোর পর্যন্ত গুরু ট্রেনিং স্কুলে পড়েছি। স্বভাবতই এতবড় স্কুলে প্রথম দিন ঢোকার পর বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম, আবার একই সঙ্গে খুব আনন্দও হয়েছিল। স্কুলে ঢোকার পর কয়েকদিনের মধ্যে অনেক নতুন বন্ধু হল আর সেই সঙ্গে রাশভারী মাষ্টারমশাইদের চিনতে শুরু করলাম। এইবার প্রাইভেট টিউশন পড়ার প্রয়োজন। তখন নীচু ক্লাসে কেবলমাত্র সেভেন আর এইট পড়াতেন বোর্ডিং এর সুধীরবাবু, প্রফুল্লবাবু, সন্তোষবাবু। একমাত্র অনিলবাবু মানে অনিল ভঞ্জ চৌধুরী মহাশয় সেইসময় ফাইভ থেকে পড়াতেন। সুতরাং বাবা আমাকে অনিলবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন।

অনিলবাবুর বাড়ি ছিল বর্তমান দেশবন্ধু ইউনিয়ন ক্লাবের কাছে। উনি বাড়িতেই সকালে পড়াতেন। লম্বা সম্ভ্রমজাগানো চেহারা ছিল অনিলবাবুর। যদিও তখন স্কুলের অধিকাংশ মাষ্টারমশাই-ই ছিলেন বেশ লম্বা চওড়া এবং ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা। সেইসময় একটা ছড়া অনিলবাবু সম্পর্কে প্রচলিত ছিল- 'অনিলবাবুর গাঁট্টা, পয়সায় আটটা। খেতে যদি চাও, হাইস্কুলে যাও।' যাইহোক আমার প্রাইভেট পড়া শুরু হল। ফাইভ থেকে এইট আমি অনিলবাবুর কাছেই পড়েছি। এই কবছরে স্যারকে নতুনভাবে চিনেছি এবং অসম্ভব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ যা আজও মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। যেহেতু বাড়িতে পড়তে যেতাম এবং স্যারের বাড়ি আমার বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার, এই পথ হেঁটেই যেতাম বলে প্রায়ই দেরী হত। স্যার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর দেরী হয় কেন?' আমি বললাম, 'স্যার আমি তো হেঁটে আসি, তাই দেরী হয়।'

> স্যার এরপরই বাবাকে একটি সাইকেল কিনে দিতে বললেন এবং বাবা আমাকে সাইকেল কিনে দিলেন। এটা একটা আমার কাছে স্মরণীয় বিষয়। কারণ ১৯৬৫ সালে আমাদের অঞ্চলে বোধহয় প্রথম আমি একটা সাইকেলের মালিক হই এবং আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ওই সাইকেলে চড়েছে।

আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করতেই হবে। স্যার সকালে যখন জলখাবার খেতেন আমরা যে দু-তিনজন পড়তাম তারাও কোনদিন রুটি, আলুভাজা, আবার কোনদিন পরোটা ইত্যাদি খেতাম। পরে আমি হিসাব করে দেখেছিলাম যে স্যার মাইনে নিতেন ১৫ টাকা, আমাদের খাইয়ে দাইয়ে স্যারের কি থাকতো। আসলে স্যার খেতে ভালোবাসতেন এবং খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। অবশ্য বাবা মাঝেমাঝেই স্যারকে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতেন। এইভাবে স্যারের সাথে একটা পারিবারিক যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে বাবা স্যারের পরামর্শ নিতেন। ক্লাস সেভেন ও এইট স্যার স্কুলে পড়াতেন রাত্রে। তখন অনেক স্যার স্কুলে পড়াতেন। আমরাও হৈ হৈ করে যাওয়া আসা করতাম। স্যারের কাছে পড়াকালীন প্রতিটি ক্লাসেই সম্মানজনক ভাবে পাশ করে উঠেছি।

ক্লাস নাইনে ওঠার পর বাবা চেয়েছিলেন আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ি, কিন্তু স্যার আমাকে কমার্সে ভর্তি করতে বললেন। বোধহয় বাবার ব্যবসার কথা মাথায় রেখে স্যার এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আজ বুঝতে পারি স্যার কত দূরদর্শী ছিলেন। সেইসময় আমাদের স্কুলের সমস্ত স্যারেরাই অত্যন্ত ছাত্রদরদী ছিলেন। তাঁরা যেমন শাসন করতেন আবার ভালোও বাসতেন।

ক্লাস নাইনে উঠে আমি সুবোধবাবু ও ইংরাজীর জন্য অমলেন্দুবাবুর কাছে পড়েছি। এঁরা সাধ্যমত আমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ক্লাস ইলেভেনে যেহেতু হায়ার সেকেন্ডারীর বছর তাই ওই বছরটা বাবা আমাকে ধীরেনবাবুর কাছে ও দুর্গাদাসবাবুর কাছে পাঠালেন। দুর্গাদাসবাবুর কাছে পড়া এক বিরল অভিজ্ঞতা। আসলে আমাদের স্কুল জীবনের এত স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে যে বলে হয়তো শেষ করা যাবেনা। ছাত্র হিসাবে আমরা কখনই খুব ভালো ছিলাম না কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ৭২ এর বন্ধুদের ব্যাচ যে যার সাধ্যমত স্কুলের মুখরক্ষা করেছিলাম, এটা গর্বের সাথে বলতে পারি। সেই সময়কার সমস্ত স্যারই ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, তবুও যেহেতু আমি চার বছর অনিলবাবুর কাছে পড়েছি এবং ছোট থেকে দেখেছি তাই আমার স্মৃতির মণিকোঠায় ওনার একটা আলাদা স্থান রয়ে গিয়েছে।

আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় নীরেনবাবু

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি

আমি বসিরহাট হাইস্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র। প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলের ছাত্র হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি। স্কুলের বহু প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সকল শিক্ষকমহাশয়ের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। তাঁদের মধ্যে যাঁর প্রভাব আমার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এবং আজকের আমি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের প্রজন্মের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নীরেনবাবু- নীরেন্দ্রনাথ সাহা - আমার শিক্ষাগুরু। আমাদের পাড়াতেই স্যারের পৈতৃক বাড়ি। সেখানেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর স্নেহস্পর্শ আমি আজও অনুভব করি।

স্যার শুধু আদর করতেন না, শাসনও করতেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি, ''শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।'' নীরেনবাবু সম্পর্কে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ছাত্র হিসাবে খুব শান্তশিষ্ট তো ছিলাম না বরং দুষ্টু দুরন্ত ছিলাম বলেই স্যারেরা সবাই আমাকে চিনতেন। কাউকে অশ্রদ্ধা না করেই বলছি, সত্যি কথা বলতে কি, কোন কোন স্যারের ক্লাসে বেশিক্ষণ মন টিকতো না। নানা অজুহাতে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম। আর পড়বি তো পড় - একেবারে নীরেনবাবুর সামনে। স্যারের হাতে আমাদের মত ছাত্রদের বিভীষিকা একটা কঞ্চির ছড়ি শোভা পেত। আর সেটির সোহাগ কতটা যে নির্মম তা আমাদের পিঠে পশ্চাতে নিদারুণ ভাবে জানান দিত। ফলে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন - আবার ক্লাসে গিয়ে ঢুকতে হত। সেই দুঃখ ভোলার আগেই স্যারের ডাক পড়তো। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কোন ছাত্র হয়তো মারামারি করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে বা কারো পা কেটে গিয়েছে- এখুনি হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে। আমরা দুরন্ত দামালরা সঙ্গে সঙ্গে রেডি। এসব কাজে শান্তশিষ্ট মেধাবী ছাত্ররা বড় একটা এগিয়ে আসত না। কখনো কখনো নীরেনবাবুও আমাদের সঙ্গে যেতেন। বুঝতে পারতাম তাঁর স্নেহের হাত আমাদের মাথায় সবসময়েই আছে। আজ আমি নিজেই একজন অভিভাবক এবং সফল ব্যবসায়ী। আজ আমি বুঝতে পারি একজন ব্যবসায়ী হতে গেলেও লেখাপড়া জানা কতটা প্রয়োজন। প্রকৃত অভিভাবকের মত নীরেনবাবু যদি সেদিন স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, শাসন করে আমাকে লেখাপড়া শেখায় উৎসাহিত না করতেন, আমি কোন্ অতলে তলিয়ে যেতাম কে জানে? নীরেনবাবু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বড় অকালে তিনি চলে গেলেন। রেখে গেলেন অসংখ্য মধুর স্মৃতি, যা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি - স্যারের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। আর স্যারের কাছে আমার প্রার্থনা, স্যার অলক্ষ্যে থেকে আপনার স্নেহাশিস্ নিরন্তর ঝরুক আমার মাথার'পর। আমি ধন্য হই।

A couple of dusted pages of history …

Dr Suptendu P Biswas

24th January, 2021 was the 144th Foundation Day of Basirhat High School, our alma mater.The creation of the School, like many other social institutions then, was part of a larger political history.[1] Post-Sepoy Mutiny in 1857, the British government wrested power from the East India Company and made certain structural changes to their administration. It was, perhaps, realized that mere extraction of wealth and brute subjugation of Indians might ignite another major uprising soon. Instead, more socio-political governance was to be adopted. As a result, multiple social institutions, schools, dispensaries and courts etc., were opened for better health, education and administration. However, to 'educate' Indians in English language and to enable them work for the British Government was an important agenda. Even a marginal place like Basirhat was no exception: The Sub-division was formed in 1861, the Dispensary in 1867 and the Magisterial Court in 1870-71. The educational drive, too, began at that juncture. A Minor School initiated by a group of enthusiasts in 1854 took its formal shape on 24th January, 1877 with recognition from the University of Calcutta.[2] It was known as Basirhat H.E. School for initial decades till it was given a new name—"Basirhat High School". For all these years, the School has been the torchbearer in nurturing young minds, which was made possible by an eminent team of dedicated teachers steered by visionary headmasters and supported by passionate civil society members.

While rummaging through our family archive, we found a couple of documents that many may consider interesting! Those were two appeals, possibly drafted in the 1930s, for raising money for improvement of the school building, infrastructure and most significantly, for the construction of the

[1] An important reference document is: *The Statistical Account of 24 Parganas and Sunderbans* (1877) by Sir William Wilson Hunter (1840-1900), who is best remembered for compilation of *The Imperial Gazetteer of India* (1881).

[2] The paragraph is based on a short historical description of Basirhat High School written by the author for BHSAA website: BHSAA (2019) [online] http://bhsalumni.org.in/ [Accessed on 30 January 2021]

central hall to be named as “The Ex-students’ Hall’. One appeal was issued by the Vice President and the Secretary of the Managing Committee of the School inviting the ex-students to contribute to the cause. A similar appeal was also prepared for the general donors. Then, the ex-officio President was the SDO of Basirhat Sub-division. I am not aware who the Vice President at the juncture was. The Secretary was Sarat Chandra Biswas, our grandfather, and both the drafts were found among his documents.

> Now, we have the formal organizational set-up of the ex-students with eminent members from all walks of life, who are not only settled at Basirhat, but also spread across India and various corners of the globe. Perhaps, the seed of such an alumni body was sown around 90 years back, and it is heartening to see the foresight of our predecessors.

Although the “Ex-students’ Hall” was conceptualized in the 1930s, it took time to implement the project. The hall was completed later, when respected Satish Chandra Bhattacharya was the Headmaster and Sarat Chandra Biswas, the Secretary. Both of them pursued the idea right from its inception; they belonged to the similar age group, enjoyed excellent mutual respect and wonderful working relationships. Later, the hall was appropriately named after respected Satish Babu, only National Teacher of Basirhat till date.

The scanned copies of the original letters are enclosed below along with the transcribed versions for an easy reading.

Source of Orginal Documents: Suptendu P. Biswas & Subhadip Biswas
Reproduced Image Credit: Subhadip Biswas

Letter 1 – An Appeal to the Ex-students of the Basirhat H.E. School.

Friend,

To you we need hardly come with any long preface about the H.E. School at Basirhat, 24-Parganas. Some of you know your old seminary but too well to require any history. The school has grown in importance, and we are glad to assure you that it now ranks with the best institutions in the Presidency Division. But it is a pity that such an important and promising school should be housed in an ugly and extremely unhealthy building scarcely able to accommodate the existing number on the rolls. Distinguished visitors have repeatedly remarked in very strong terms on the necessity of replacing the existing school-house by a decent, up-to-date building. Want of initiative and earnestness on the part of the governing bodies so long stood in the way. We have, this time, managed to be returned to the Committee of Management with the a vowed object of pilating the scheme reconstruction of the school building. But, friend, the question of funds stands almost an insurmountable barrier in our way. The total cost is roughly estimated at Rs. 30,000/- one-third of which may be expected from Government. The school has not been able to build up any substantial reserve fund to fall back upon at an emergency like the present one. We have, therefore, to look up to extraneous sources for help. But we can hardly count upon as much active sympathy of the public generally as of you on whom we have special claim. Herein we can see the most bracing silverlining, and we are confident, friend, with your hearty co-operation we shall be able to carry out our scheme. Like you we too are among the old students of this school. And we have, in this connection, an idea of commemorating our association with the school in a fitting practical way. We have thought of creating a splendid cental hall to be named “The Ex-students’ Hall” the cost of which Rs. 10,000/- in round figures, is to be met by the whole galaxy of the worthy children of this seminary. The school is badly in need of such a hall. We, therefore, appeal to your sense of moral obligation with all the earnestness we can command. The case demands immediate attention, and we fervently hope you will favour us with a sympathetic and generous response.

Vice-President.

Secretary.

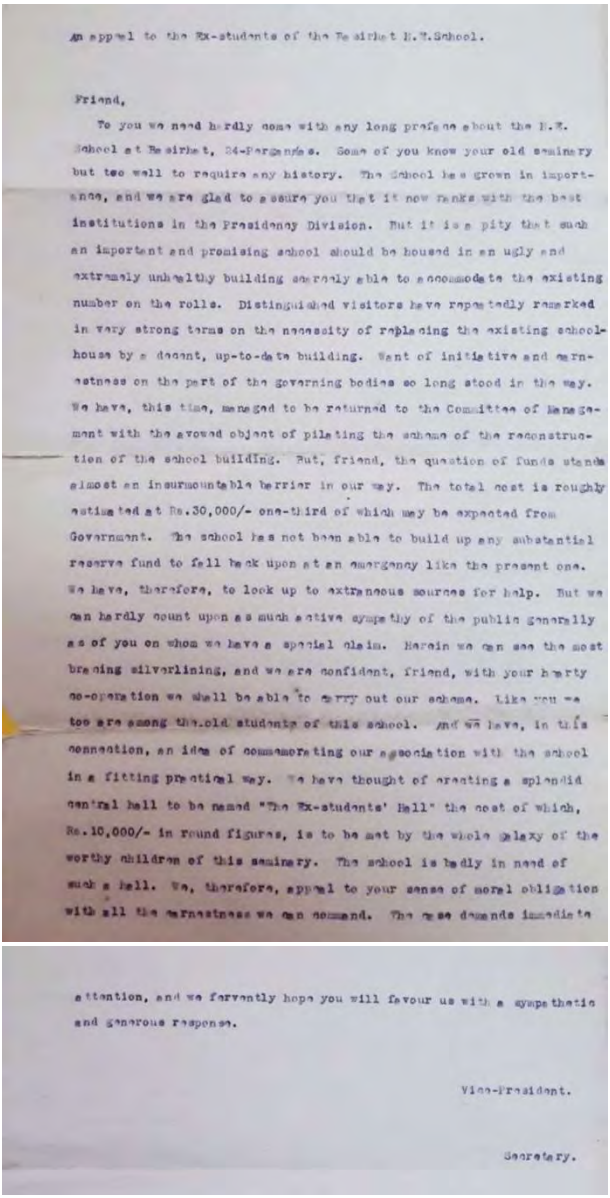

An appeal to the Ex-students of the Basirhat H.E.School.

Friend,

To you we need hardly come with any long preface about the H.E. School at Basirhat, 24-Parganas. Some of you know your old seminary but too well to require any history. The School has grown in importance, and we are glad to assure you that it now ranks with the best institutions in the Presidency Division. But it is a pity that such an important and promising school should be housed in an ugly and extremely unhealthy building scarcely able to accommodate the existing number on the rolls. Distinguished visitors have repeatedly remarked in very strong terms on the necessity of replacing the existing schoolhouse by a decent, up-to-date building. Want of initiative and earnestness on the part of the governing bodies so long stood in the way. We have, this time, managed to be returned to the Committee of Management with the avowed object of piloting the scheme of the reconstruction of the school building. But, friend, the question of funds stands almost an insurmountable barrier in our way. The total cost is roughly estimated at Rs.30,000/- one-third of which may be expected from Government. The school has not been able to build up any substantial reserve fund to fall back upon at an emergency like the present one. We have, therefore, to look up to extraneous sources for help. But we can hardly count upon as much active sympathy of the public generally as of you on whom we have a special claim. Herein we can see the most bracing silverlining, and we are confident, friend, with your hearty co-operation we shall be able to carry out our scheme. Like you we too are among the old students of this school. And we have, in this connection, an idea of commemorating our association with the school in a fitting practical way. We have thought of erecting a splendid central hall to be named "The Ex-students' Hall" the cost of which, Rs.10,000/- in round figures, is to be met by the whole galaxy of the worthy children of this seminary. The school is badly in need of such a hall. We, therefore, appeal to your sense of moral obligation with all the earnestness we can command. The case demands immediate attention, and we fervently hope you will favour us with a sympathetic and generous response.

Vice-President.

Secretary.

Basirhat High School (Image Credit: Achintya K Das)

Letter 2 : An Appeal to General donors

The H.E. School at Basirhat, 24-Parganas, is a highly useful institution of more than 50 years' standing. It is a Government aided school, and has, within last decade, made a name as one of the best institutions in the Presidency Division. But the school house, with occasional extensions of a makeshift character, presents a clumsy mess of buildings – the classooms being ill-ventilated, ill-lighted, and consequently extremely unhealthy, scarcely fit to accommodate the present number on the rolls. The question of a decent, up-to-date building, sufficient to accommodate at least 450 boys, has, therefore, become a crying and paramount necessity. Distinguished visitors have, again and again, urged the authoities of the school to see to a solution of this problem which, for want of initiative and earnestness, has been shelved from year to year. The condition of the existing school house, from the point of view of sanitation and accommodation, is so bad that futher postponement of the question of reconstruction of the school building is likely to affect the future of this rising school. But the question of funds confronts us at the very outset. Expert

opinion roughly estimates the cost at Rs. 30,000/- one-third of which we may expect fom Government as a building grant. The resources of the school are too slender to be of any material help to us. We have, therefore, no alternative other than appealing to the generous public to come to our aid with liberal contributions. It will not be out of place to assure the public in this connection that we have a still higher object in view. If, through God's grace, adequate funds are available, we have a mind to carry out a rather ambitious but highly useful scheme – we mean the starting of a Second grade College at Basirhat teaching upto the I.A. and …The educated public are aware how very difficult and expensive it has been to have a boy admitted into any college in Calcutta for higher University education. The congestion caused by swarming candidates for admission coupled with an ever-increasing rate of expense scares away many willing and deserving [mofussil] students who, for want of opportunities have to give up their studies prematurely. It is, therefore, in our contemplation to utilize the surplus money, if any, in organising ways and means for the removal of such

a keenly felt want. Education is the first and foremost determining factor in the elevation and regeneration of social and national life. Our appeal, therefore, we have reason to hope, will meet with a prompt and sympathetic response. Be it mentioned here that a minimum contribution of Rs. 100/- will entitle a donor to be ranked as a benefactor who will be given the privilege of exercising his franchise at every re-constitution of the Managing Committee.

Sub-divisional Officer, Basirhat
& President of the Managing Committee.

Vice- President.

Secretary.

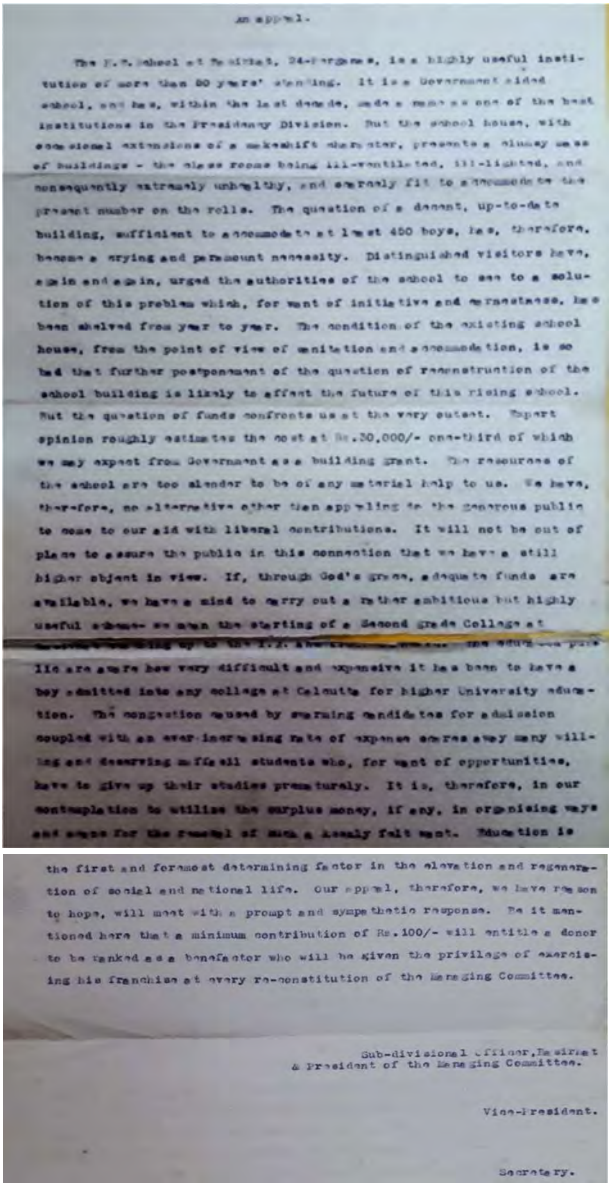

An appeal.

The H.E. School at Basirhat, 24-Parganas, is a highly useful institution of more than 80 years' standing. It is a Government aided school, and has, within the last decade, made a name as one of the best institutions in the Presidency Division. But the school house, with occasional extensions of a makeshift character, presents a clumsy mass of buildings - the class rooms being ill-ventilated, ill-lighted, and consequently extremely unhealthy, and scarcely fit to accommodate the present number on the rolls. The question of a decent, up-to-date building, sufficient to accommodate at least 450 boys, has, therefore, become a crying and paramount necessity. Distinguished visitors have, again and again, urged the authorities of the school to see to a solution of this problem which, for want of initiative and [illegible], has been shelved from year to year. The condition of the existing school house, from the point of view of sanitation and accommodation, is so bad that further postponement of the question of reconstruction of the school building is likely to affect the future of this rising school. But the question of funds confronts us at the very outset. Expert opinion roughly estimates the cost at Rs.30,000/- one-third of which we may expect from Government as a building grant. The resources of the school are too slender to be of any material help to us. We have, therefore, no alternative other than appealing to the generous public to come to our aid with liberal contributions. It will not be out of place to assure the public in this connection that we have a still higher object in view. If, through God's grace, adequate funds are available, we have a mind to carry out a rather ambitious but highly useful scheme- we mean the starting of a Second grade College at [illegible] up to the I.A. [illegible] The educated public are aware how very difficult and expensive it has been to have a boy admitted into any college at Calcutta for higher University education. The congestion caused by swarming candidates for admission coupled with an ever-increasing rate of expenses scares away many willing and deserving mofussil students who, for want of opportunities, have to give up their studies prematurely. It is, therefore, in our contemplation to utilise the surplus money, if any, in organising ways and means for the removal of such a keenly felt want. Education is the first and foremost determining factor in the elevation and regeneration of social and national life. Our appeal, therefore, we have reason to hope, will meet with a prompt and sympathetic response. Be it mentioned here that a minimum contribution of Rs.100/- will entitle a donor to be ranked as a benefactor who will be given the privilege of exercising his franchise at every re-constitution of the Managing Committee.

Sub-divisional Officer, Basirhat
& President of the Managing Committee.

Vice-President.

Secretary.

Best Wishes from

Shri Gaurab Das

CHARTERED ACCOUNTANT

1986 HS from Basirhat High School

K. R. DAS & CO.

Best Wishes from

Shri Mrinal Kanti
MALLIK

1984 Madhyamik
from Basirhat High School

* * *

In the memory of

Late Bibhutosh Biswas

1928 Matriculation from Basirhat High School,
then Basirhat H.E. School

* * *

Offering gratitude to
Basirhat High School
for 144 years of teaching, training and building future generation and thankful to BHSAA for the good work to support the school and community.

Best wishes from
A grateful family

জীবনব্যাপী ও জীবনমুখী শিক্ষা

শ্রী দিব্যেন্দু সরকার

ওর নাম সুশীল। তবে নামেই। কাজে কর্মে ঘোর বিচ্ছু। আট ক্লাসে মাষ্টারমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝাচ্ছেন ণত্ববিধান আর ষত্ববিধান। ওদিকে সুশীল দলা করা কাগজ বাধিয়েছে গার্টারের মাথায়। পন্ডিতমশাই বোঝাচ্ছেন, 'ঋ, র (ৃ), রেফ (র্), ষ (ক্ষ) বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন: ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বিষ্ণু, বরণ, ঘৃণা'। ওদিকে টান পড়েছে গার্টারে। বুলেটের মত কাগজ ছুটে গিয়ে লাগে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে থাকা সুমিতের মাথায়। মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষমাসুন্দর চোখে পিছনে তাকায় সুমিত। চোখাচোখি হয় সুশীলের সঙ্গে। তার তখন চোখ হাসছে। ক্লাসে সবদিনই ব্যাক বেঞ্চার। পড়াশোনায় মন নেই একটুও। ক্লাসের গন্ডি পেরনোয় চাপ আছে বেজায়। কিন্তু পেন্সিলের টানে যখন ছবি আঁকায় বিভোর হয়ে যায় তখন সেই দুষ্টু কিশোর কেমন তন্ময় হয়ে যায়। ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানটা ওর বাঁধা। এত দুষ্টুমি সত্ত্বেও ওকে ভালোবাসে সহপাঠীরা।

মফস্বল শহরের স্কুলের আরেক ছাত্র বিশ্বকর্মা। একেবারে সার্থকনামা। সামনে একটা অচল যন্ত্র ফেলে দাও। কীসব খুটখুট করে যন্ত্রটাকে সচল করেই ছাড়বে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ওর নাওয়া খাওয়া বন্ধ। স্কুলের ফার্স্টবয়ও যখন কোন যন্ত্রের গোলযোগে নাকাল, ছুটে আসে বিশ্বকর্মার কাছে। অথচ এই ছেলেটা অংকের ক্লাসেও সিঁড়ি ভাঙার শেষে চূড়ায় পৌছতে পারল না কোনদিন।

সুশীল, বিশ্বকর্মারা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না কখনো। ঘষতে ঘষতে এগোয় খানিকটা। তারপর একদিন হারিয়ে যায়। ওদের মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভা? তারও অকালমৃত্যু ঘটে রোদ জলের অভাবে। ওরা কিন্তু একেবারেই ব্যতিক্রম নয়। আমাদের স্কুল কলেজের দরজায় যতজন প্রবেশ করে তার কত শতাংশই বা অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

যে ক'বছর নীচের ক্লাসে থাকা যায় তাও দুপুরে খাবারটা জোটে। ক্লাস নাইনে উঠে গেলে তাও আর পাওয়া যায় না। এর থেকে নীচের ক্লাসে থেকে যেতে পারলেই তো ভালো হত, ভাবে অনেক ছাত্রছাত্রী। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের যে সাঁওতালি ছেলেটা সে কেন বাবর-হুমায়ুন-আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহান-

-ঔরঙ্গজেব-এর মোঘল সাম্রাজ্যের বংশলতিকা মুখস্থ করতে উৎসাহ পাবে? ওর কাছে তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রুখাশুখা মাটির চরিত্র বোঝা, যে মাটিতে ফসল ফলানোর সংগ্রাম ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ওদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে না। আর এখানেই আসে জীবনমুখী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছে তার চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কী আছে সেই লক্ষ্যমাত্রায়? ''সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি''। এখানে অনেকগুলি শব্দবন্ধ বিশেষ দ্যোতনা বহন করে। 'সকলের জন্য শিক্ষা', 'অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা', 'গুণগত শিক্ষা', 'জীবনব্যাপী শিক্ষা' এই শব্দবন্ধগুলির প্রতিটিই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই ক্ষেত্রগুলোতে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আর এখানেই আসে জীবনমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এটা আমাদের সবার আগে মানতে হবে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তার সবরকমের সদর্থক ব্যক্তিগঠনের ক্ষমতা সত্ত্বেও সবার জন্য সমভাবে কার্যকরী নয়। একটা পর্যায়ে পৌঁছলে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এটা ঠিকই, কিন্তু অনেকের পক্ষেই সেই পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ তারা পূর্ণমাত্রায় নিয়ে উঠতে পারে না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের দুটো উপায়ের কথা ভাবা যেতে পারে। এক, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দেওয়া, এবং দুই, প্রচলিত শিক্ষার সমান্তরালে জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা। প্রথমটি আমাদের হাতে নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টি চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে। এখানেই আসে বিশ্বজুড়ে প্রবর্তিত এক অন্যতর শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ- 'আফটার স্কুল প্রোগ্রাম'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইদানিং অত্যন্ত জনপ্রিয় এই বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিতে স্কুলের ছুটির ঘন্টা পড়ে যাওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে রেখে আরও কয়েক ঘন্টা নানান অ্যাক্টিভিটি ও গেমস-এর মাধ্যমে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত সময়ব্যাপী এই প্রোগ্রাম এখন লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করেছে। বিষয়টি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে এজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সৃষ্ট হয়েছে এবং বিভিন্ন সংগঠন ব্যবসায়িকভাবে স্কুলে স্কুলে এই পরিষেবা দিয়ে থাকে (এরকম একটা আফটার স্কুল প্রোগ্রাম আমরা, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ভাবতে পারি না?)।

আমাদের দেশে আফটার স্কুল প্রোগ্রাম অবশ্যই ফান-লার্নিং এর থেকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে। এখানেই আসবে জীবনমুখী শিক্ষার প্রসঙ্গটি। এই অতিরিক্ত সময়টাকে ব্যবহার করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছুটা বৃত্তিমূলক শিক্ষাচর্চায় উৎসাহ দিতে। যার যেদিকে উৎসাহ আছে, যার যেকাজে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে তা চিহ্নিত করে ছোটছোট দলে নির্দিষ্ট বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই কিন্তু অনেক পিছিয়ে থাকা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলকে তাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবে। এই উদ্যোগ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার ক্লাসের থেকে অনেক বেশি জীবনমুখী হতে হবে। সিলেবাসে আছে আর তাই কিছুটা সময় দিয়ে কিছু কিছু শিখিয়ে দেওয়া নয়, ছেলেমেয়েরা যাতে সত্যি সত্যিই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে কার্যক্রম সাজাতে হবে। বিশেষ জোর থাকবে সেই সব ছাত্রছাত্রীদের ওপর যারা প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ ততটা নিতে পারছে না, অথচ এই ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতের পথ খুঁজে নিতে পারে। প্রসঙ্গত, এই ধরণের আফটার স্কুল প্রোগ্রাম যেহেতু অ্যাক্টিভিটি কেন্দ্রিক, অনেক সময়ে দেখা যাবে যে তথাকথিত পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ফলে প্রচলিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও উৎসাহী হয়ে উঠবে। ফলে শিক্ষা ও জীবনযাত্রার একধরণের মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব হবে।

এই আফটার-স্কুল কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরে ছাত্রছাত্রীদের ছাড়িয়ে বয়স্ক মানুষের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগকে সংহত করা যেতে পারে। বয়স্কদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারের একাধিক কর্মসূচি আছে। কিন্তু সেইসব কর্মসূচির বেশিরভাগটাই যতটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবসায়িক স্বার্থপূরণের অনুপন্থী, ততটা দরিদ্র মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে সরকারের ইচ্ছা আর মানুষের উপকারের মধ্যে একটা ফাঁক থেকেই যায়। এরই সমান্তরালে স্কুলের পরিকাঠামো ব্যবহার করে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের ইতিমধ্যেই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে একটু সংহত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এ ধরণের কিছু কিছু প্রচেষ্টা আমাদের রাজ্যেও চলছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাত ধরে। সেই উদ্যোগে সামিল হতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

The Mould of our Mindset and Ways to break through it

Shri Saugata Bhattacharyya

Let's take any school in India randomly and put up a question to any student in any class: What would you want to be, when you grow up? Why are you studying? And surely the answer, in general, would be, we study to get a job. The students might be from a varied array of families. Someone's parents are in jobs, someone is from a weaver's family, someone is a carpenter's son, somebody is a potter's daughter, and someone is from a farmer's family. And yet, everyone's looking for a job (ideally a Government one) and almost none is ready to pick up their forefathers calling and take it to a new dimension or any other business. There are exceptions; we would come to that later. But for the general scenario, if we dig a little deeper, we may find the root cause of this strange phenomenon.

All the schools of modern India started coming to being in the early British era and the education system was designed by the British to produce millions of clerks and copiers over the ages to form a robust support system for their administration.

Unfortunately, even after the Independence, the basic structure and purpose of the system is not changed much. It is kind of imbibed in the mindset of all the participants of the system. As a result, till date, we continue to churn out only employees. In this blog we would explore the ways to get rid of this mould.

Before going into the details, let's have a quick look at few of the exceptions that I mentioned earlier. While working in Middle East Asia, I had to lead a small group of Engineers & Draftsmen, who were mostly from the western

coasts of India. Both the draftsmen, that I had, are from carpenters' families and along with their ancestral expertise, acquired knowledge in AutoCAD drafting as well to take their ancestral business a notch higher. They had a clear vision and were there to get the global exposure, make some money and in course of time get back home to start their venture of making world class furniture.

In the last few years of the last millennium, I had to occasionally travel to Rajasthan from Delhi on official tours. Each of these train journeys were marked by immense exposure to the milieu of the great province of India. In every journey, I found groups of young people, in every compartment of the trains plying between Delhi & Ahmedabad, who are engrossed in serious discussions. They are young, energetic and full of dreams and seemingly not exactly indulged in petty teenage gossips. Their body language intrigued me and as I consciously started overhearing them (the local dialect isn't too difficult to follow, if you know Hindi) I was blown away by the sheer strangeness of their common topic. THEY WERE DISCUSSING BUSINESS!! None of the teenage boys were discussing their studies or Madhuri Dixit or the Railway Recruitment Board Examinations (like they usually do in other parts of India)!

They were actually discussing business ideas, relentlessly exchanging business information throughout their journey about which trade or which product or which service can maximize returns in minimum time period! Soon I discovered, they had come out of their homes with little capitals, left their comfort zones to accomplish a mission. They are out to taste the water of the market, multiply the seed capital with as many number as possible in a given time frame, and return it to the elders of the family to prove themselves!! I happened to witness a grand tradition existing in this part of the globe for thousands of years!! For the first time in my life, I sensed freedom and hailed the people who encourage their future generations to write the destiny of life with their own hands!!

This is exactly what we need to do as a nation as well!! Throughout the country, the education system has to be remodeled fast in order to change the perspective of all the participants. Along with History, Geography, Literature, Science and Mathematics, children must learn about Accounting and Banking from very young age. Along with the lives and works of religious and political leaders, Prophets, Poets, Philosophers, Scientists and

Revolutionaries. Children must learn about the lives and works of great business leaders, visionaries and Industrialists as well. Along with Science, Mathematics and Humanities projects, students must take part in Business projects, where they would study the local business models, find the pros and cons, research the demand-supply gap, the competition and submit a field report.

Once I was travelling to a mofussil town towards east of Calcutta and I chanced to meet a young man, clearly of African origin. I wondered what was he doing there and asked him so in English! He replied in Bengali that he was trying to source best quality prawns for an export order he had received already!! This is something out of the box! Finding a business opportunity always and everywhere is a tremendous virtue and definitely increases the probability of success! this needs to be practiced as a fun, an adventure, keeping in mind the famous advice of one of the wisest men of our times, “always test the water with one foot on the ground”.

They would also learn how to plan a business, how to be an entrepreneur -- a self sufficient, free individual, a leader rather than just an employee.

With the advent of technology, lots of new avenues are opening up very fast and the world is coming closer and the market is growing larger every moment. It’s amazingly easier these days to get access to a huge volume of data from the globe which could not be thought of even twenty years back. It’s amazingly easier these days to reach out to any corner of the globe. Today’s communication network has enabled us to function as a member of the global village. Huge online platforms have come into existence to sell and source everything on this planet, to network with anyone of the world and this is a tremendous era in the history of Mankind to get rid of our old moulds, to explore, discover and exceed ourselves!!

Jai Hind!!

সভাপতি কর্তৃক BHSAA -র পতাকা উত্তোলন

'শতবর্ষের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ' (২০১৯)
- অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

'শতবর্ষের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ'
-স্মারক প্রদান

'আচার্য প্রণাম' অনুষ্ঠান (২০১৯)

স্বাস্থ্য

কোভিড ও শৈশব

ডাঃ মহুয়া সরকার

Image Credit: Monica May (2020)[3]

সারা বিশ্ব এখন কোভিড অতিমারীতে আক্রান্ত। বিশ্বের বিপুল জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ এই অতিমারীর ভয় এবং সংক্রমণে পীড়িত। তবে শিশুরা এর মুখ নয়। কারণ কোভিড সংক্রমণ শিশুদের ওপর সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে কী কোভিডের কোনো প্রভাব শিশুদের ওপর নেই? বিশ্বের তথ্য ভাণ্ডারের ওপর চোখ রাখলে দেখা যাবে শিশুদের ওপর এই অতিমারীর প্রভাব অনেক গভীর এবং সুদূর প্রসারী।

বিশ্বের সমস্ত দেশের সব বয়সের বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্ত। প্রধানত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যের ক্ষতি। তবে সব শিশুর ওপরেই ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়। দরিদ্রতম দেশের শিশুরা এবং যারা আগে থেকেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণী তাদের ওপর এর প্রভাব তীব্রতম।

[3] May, Monica (2020) 'A scientist's perspective on the coronavirus (COVID-19) pandemic', *Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute.* [online] https://www.sbpdiscovery.org/news/beaker-blog/a-scientists-perspective-on-coronavirus-covid-19-pandemic [Accessed 12 Feb, 2021]

এবারে দেখা যাক কীভাবে এই অতিমারী শিশুদের এই সর্বগ্রাসী করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে:

১) অনেক বেশি সংখ্যায় পরিবার দরিদ্রতার সম্মুখীন

UNICEF এর সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে প্রায় 117 million শিশু চরম দরিদ্রতার সম্মুখীন হবে ২০২০-র শেষে। বিভিন্ন দেশের দীর্ঘ Lockdown মানুষের জীবন ও জীবিকায় কুপ্রভাব ফেলেছে। কাজ হারানোর ফলে জীবন ধারণের মৌলিক জিনিসগুলি এখন মানুষের কাছে অপ্রতুল, যেমন খাদ্য, জল, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এর ফলে বেড়েছে শিশুদের ওপর সামাজিক ও ঘরোয়া হিংসা।

২) শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র ক্ষতি

118 টি দেশে সমস্ত দেশব্যাপী স্কুল বন্ধ থাকার ফলে প্রায় 1.6 billion শিশু ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দেশ দূরশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও অল্প আয়ের দেশগুলির ক্ষেত্রে সেটা মাত্র 30 শতাংশ।

৩) শিশুদের স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকার ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি

যদিও শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর কোভিডের সরাসরি কোনো প্রভাব নেই কিন্তু বাবা মায়ের অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা, যত্ন নেবার মানুষের অভাব, টীকাকরণ ব্যাহত হওয়া ইত্যাদির জন্য শিশুরা নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে, সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য 5 বছরের নীচে শিশুর অতিরিক্ত মৃত্যু প্রায় 1.2 million হতে পারে আগামী 6 মাসে।

৪) দুর্বল শিশুদের অপুষ্টির অভাব

বিশ্বের সমস্ত দেশে সামগ্রিক Lockdown এবং Containment Zone এর নীতি প্রয়োগের ফলে খাদ্যের যোগান এবং গুণগত মান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন উপায়ে Covid-19 এর ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে খাদ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জীবনের মান অত্যন্ত দুর্বল জায়গায় পৌঁছেছে। এই সবগুলি কারণ শিশুদের অপুষ্টির জন্য ভীষণ ভাবে দায়ী।

৫) জীবনদায়ী টীকাকরণ থেকে বঞ্চিত শৈশব

প্রতিবছর প্রায় 2 থেকে 3 million জীবন রক্ষা হয় জীবনদায়ী টীকাকরণের মাধ্যমে। কিন্তু Covid-19 এই পুরো জীবনদায়ী পদ্ধতির ওপর সরাসরি কুপ্রভাব বিস্তার করেছে। নতুন তথ্য অনুযায়ী প্রায় 14 million শিশু 2019-এ কোনো টীকা পায়নি, প্রায় 6 million শিশু কিছু পেয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ পায়নি। সুতরাং Covid-19 এর ফলে কিছু টীকা পাওয়া এবং কোনো টীকা পায়নি এমন শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে ভবিষ্যতে অসুস্থ শিশু এবং শিশু মৃত্যুর হার বাড়বে।

৬) HIV -এর সঙ্গে যুদ্ধের উন্নতি ক্ষতিগ্রস্থ

শিশুদের মধ্যে নতুন করে HIV সংক্রমণের হার প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল শেষ দশকে। কিন্তু Covid-19 এর ফলে এই লাভজনক পরিস্থিতি ক্ষতিতে রূপান্তরিত। নতুন করে HIV সংক্রমণ প্রায় দ্বিগুণ হতে চলেছে আগামী 6 মাসে এবং এর ফলে শিশুমৃত্যুও চোখ রাঙাবে।

সমীক্ষা বলছে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেতে চলেছে আগামী 20 বছর। 2000 সালে প্রায় 94 million শিশুশ্রমিক হ্রাস করানো গিয়েছিল। কিন্তু এই লাভ এখন ক্ষতিগ্রস্ত। যেহেতু Covid-19 দরিদ্রতা বাড়িয়েছে, সুতরাং এর ফলে পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিশুশ্রমও বাড়ছে। UNICEF-এর তথ্য অনুযায়ী 1% দরিদ্রতা বৃদ্ধি 0.7% শিশুশ্রম বৃদ্ধি করে।

৭) শিশুদের সুরক্ষায় প্রশ্নচিহ্ন

আমরা অভিভাবকরা কীভাবে আমাদের শিশুদের এই অতিমারীর কুপ্রভাবের হাত থেকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সুরক্ষিত রাখবো? নিম্নলিখিত ৬টি উপায়ে আমরা অনেকাংশে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সাহায্য করতে পারি--

১) অভিভাবকদের নিজেদের শান্ত এবং সংযত থাকা: অভিভাবকদের শিশুদের সঙ্গে শান্ত এবং সংযত কথোপকথন তাদেরকে মানসিকভাবে সুরক্ষিত অনুভব করতে সাহায্য করে।

২) একটি নির্দিষ্ট দৈনন্দিন নিত্যকর্মের মধ্যে শিশুদের রাখা: অভিভাবকদের শিশুদের জন্য একটি দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ঠিক করে দেওয়া উচিত। যার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় খেলাধূলার জন্য এবং কিছুটা সময় দূরভাষের মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য থাকবে।

৩) শিশুদেরকে তাদের আবেগ অনুভব করতে দিন: দীর্ঘসময় স্কুল না যাওয়া, বন্ধুদের থেকে দূরত্ব ওদের মনে প্রভাব ফেলেছে। অভিভাবকদেরই কর্তব্য শিশুদের আবেগ বুঝে তাদের এই কঠিন সময় অতিবাহিত করতে সাহায্য করা।

৪) এই অতিমারী নিয়ে ওদের চিন্তাভাবনায় নজরদারী: শিশুরা কী ভাবছে এই পরিস্থিতি নিয়ে, সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত। তাদের কোনো ভুল তথ্যের বশবর্তী হতে দেওয়া যাবেনা।

৫) ওদের মনকে অন্য দিকে পরিচালনা করা: বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে দিনের বিভিন্ন সময়ে শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা ওদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

৬) অভিভাবকদের নিজেদের ব্যবহার সংযত রাখা: আমাদের ব্যবহারের উপরেই শিশুরা সম্পূর্ণরূপে মানসিক ভাবে নির্ভরশীল। তাই প্রতি মুহূর্তে ভয় ভীতি কাটিয়ে শিশুদের নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

ওপরের তথ্যগুলির মাধ্যমে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা গেল শিশুদের উপর Covid-19 এর প্রভাব এবং অভিভাবকদের ভূমিকা। আমরা আশা করব এই অতিমারী একদিন শেষ হবে। প্রকৃতি আবার পৃথিবীকে সুস্থ করবে। আমরা সর্বতোভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই অতিমারীর কুপ্রভাব থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র ঃ UNICEF

Reflection
of a COVID pandemic year

Dr Shahedal Bari

It has been a rare year when the world has seen the effect of COVID -19 virus worldwide affecting people's life, livelihoods and the effect of pandemic on people's physical and mental health, health care services, industries, employment, vocation, environment and Education.

Pulmonologists have long been predicting a pandemic of SARS virus. Since 2000, there have been several academic articles in Respiratory medical journals how to handle bird flu. It was only a matter of time when rather than whether, there would be a pandemic or not. Given the healthcare structure of the world is geared for treatment of diseases rather than prevention, this was not seen as a priority for different government of different countries. The current COVID-19 (SARS COV2) had first been declared in Wuhan province in China in Jan 2019 and it was only a matter of time that it would spread across the world fast, given the world has changed significantly since the Spanish Flu in 1918 due to expansion of aviation industry and people movement.

The source infection is a spherical RNA virus which causes a self-limiting infection. However, a significant minority develop viral pneumonia and respiratory failure causing death. Now people are aware of the at-risk population depending on their ethnicity, age, and other medical conditions which includes smoker's lung, diabetes, heart, kidney disease and low immunity secondary to drugs or chemotherapy for cancer treatment. The virus itself is from a large family of viruses which can cause common cold and other respiratory diseases. It is a single-stranded RNA virus, and it can mutate. The death caused by the virus mainly through an immunogenic reaction affecting lungs and causes respiratory failure. To date of death toll has been really high and different health system in different countries has not coped with the surge of the number of people suffered from corona virus related disease. It has also impacted on normal treatment of other diseases as the capacity of health care system could not cope.

At present in UK there have been 2.49 million cases with death toll of 73,000. Worldwide as per WHO data the total number of deaths is 1.82 million. India has reported 10,286,700 cases of which 9.860,000 recovered and a death of 149,000. We need to be mindful of extrapolating this data as the definition of COVID death is different in different countries, as per UK the government change the act of death in March 2019, anybody who had symptoms even though they were not COVID positive and died for any reasons had to be counted as COVID death which in my view has inflated the figure. This however had an impact on people to stay at home and to follow the rules of social distancing, use of mask hand hygiene and self-isolation. This saw numbers go down in September- October time however the second surge is back in, as people were going back to that kind of some normalcy in their life. While I am writing this, UK government has announced different level (Tier 1 to tier 4) of lockdown in different areas of UK depending on the number of cases.

This clearly exposed our human resilience to deal with pandemic and also the inequality and unfairness of the society in different countries, how people have been affected including their health livelihood, effect on personal relation, family, job and most importantly education. This has affected more to the families of all countries who are socially backward and poor and has got less access to computers and electronic media.

However, there are also lots of positive things we have seen all over the world including effect on environment. There has been no time in history of aviation including world War one and two where the whole world has stopped passenger flights across countries and close their borders for significant amount of time. This has had a significant impact on economy and on our environment on our carbon footprint. There have been real stories of how the trees, plants birds behaved differently, and animals have been seen roaming around in towns, cities, where they would not be normally seen. Stories of dolphins coming to the harbours where they would have never been seen before that the water got cleaner. In a very short time people has adjusted to work from home for those who has got access to electronic media and Microsoft/zoom meeting flourished. People realised that it is possible to work from home for those whose work could be done through electronic media. Although the industry, manual workers and the vocational jobs has had significant effect on their earning and livelihood in those countries where they are not supported by the government. The generosity of people and support to National Health Service in UK from people were humbling.

The impact of people's livelihoods cannot be underestimated as millions of people have lost their jobs, big companies could not sustain their business, and big names on high streets closed the shutters down. Here again we see a huge difference of effect on people in the welfare state like Western Europe where people assured to get their food, shelter and health care free from state unlike countries of African, middle east or, Indian subcontinent where state help for people's daily livelihood is very little. We have seen a huge effort by people themselves to help each other running public kitchens and pictures of queues of people waiting for food on Facebook. Again, the goodness of the people coming forward and the altruistic nature came out in India.

A country gets judged by how they look after the most vulnerable people and in some Western European welfare countries we have seen how the most vulnerable people have been supported by state getting them to hotels to isolate.

Not all countries have the infrastructure for this to happen hence the poorest and the most deprived have suffered most. The debate of the timing of the lockdown in different countries will go on and the balancing impact of economy and people's life will go on too however it is important to note that people had to stay at home during the daytime and their working time with the family which they haven't done before for that length of time. A forced holiday at home had its impact, some realised how important to spend time with their nearest and dearest. In others, the number of mental health problem has gone up specially in youngster in first world countries as in UK the mental health issues of under 18 did see a significant surge in October November time as they could not go out to mix with friends or play games or attend school. The positive effect seen in how neighbours supported each other for doing the shopping for elderly and vulnerable gave us a different view of who we are and how do we behave in different circumstances of human crisis. The contributions of artists, poets, singers, and writers in social media could not be underestimated too.

The whole pandemic has uncovered a significant number of vulnerable areas and showed how vulnerable and unequal our systems are. Worldwide there have been differences of opinion whether this pandemic is real where they use a mask is needed and the politics around it and lack of health education allowed fake news to spread too. We have also seen a huge rise in black life matters movements in America which did spread to Europe as well, again this virus has uncovered the social inequality and unfairness and the treatment by different government of different population differently with that of race, colour, gender and religion in different parts of the world.

COVID 19 had a significant negative impact on young people including their physical health and mental health amongst those who were not attending schools and had poor to access to resources and materials and hasn't got the tools which are conducive to learning. A recent survey of more 1200 in June showed 74% of the teachers agreed the schools being closed over a period of lockdown had a negative impact on their mental health.

We know that school and college play a very important role in young people's mental health as well as providing a stable routine/discipline and consistency. The schools provide a protective environment for their mental health and improve their connectivity to trusted friends and teachers with

pastoral support which helps them to flourish. Groups who are from deprived background will have more disadvantages to rise as a successful adult in future. The current crisis is going to have a long-lasting impact on those people's mental health and their performance in school and also growth into their own society.

It is important for the government to consider ring fencing of funding for people from poor socio-economic background in school to reduce inequality and allowance for an improved transition period for at least one academic term to reduce the mental distress.

The altered quality of assessment may impact on poor differentiation between highly achieving students and students in need. Enabling face-to-face support to resume within the healthcare guidelines respective country of social distancing is a challenge given the school footprint of physical space is limited. It is very clear government of all countries need to give a much more emphasis on education to ensure clear funding of improving number quality staffing in schools. This is more important for countries like India where government seem to be more interested in improving religious infrastructures rather than school, college, and healthcare facilities both in states and centre.

It is becoming increasingly clear that the impact of coverage on education would be significant and it would vary between affluent people and other people in need including different demographics gender and young students who have to help their family for their earning as in farmers or other industrial areas. The rise of unemployment across the world has had an inverse effect of education as not in all countries education is funded by the government, hence students are reliant on the parental income and number of people leaving schools seems to

Studies in UK show that, children from affluent household spend 30% more time educationally with better and appropriate tools than children from poorer background.

be going up. It is also evident from the studies that the highest number of employees lost job in private sector than public sector. “We need to act as quickly as possible to avoid a pandemic generation of young people with poor education and employment prospects’’ as mentioned by Stephen Evans Executive of learning and work Institute in UK.

I wonder how hard it is for Indian subcontinent where 70% of the students in high school would not have access to a laptop or appropriate electronic device where they were supposed to join the school during the lockdown time. The student surveys clearly showed that the biggest concerns are the predicted grades will be lower and that they will achieve in an exam. This will have the potential to widen the inequalities that exist when people leave education.

In a recent study of more than 3000 students in UK showed that 31% of the students felt that they were bored, stressed, they couldn’t relax and they had unproductive days which are affecting their ability to concentrate and motivate themselves for education which is worrying. The physical health impact on getting obesity not to be underestimated either. However, it was encouraging to see that at least 46% of the young people surveyed had had access to mental health support from a school or a university counselor and also had had private support from family and professionals which was useful to them loneliness. The students who have joined friends though electronic media or zoom classroom or team’s classroom were much better off in addressing some of the challenges. The reinventing systems of grading exams, assessment, and re-thinking about how we cater education for a diverse society with significant inequality and unfairness is a challenge and a half. The disadvantage group of students where they could not access schools or join electronically classes will be affected significantly for this year and the growth in their lifetime the diversity of provision poses a significant challenge. Providing appropriate support and also taking appropriate assessment not underestimating the impact of those assessments to the vocational areas (medical, nursing engineering students who will come out this year) will have a very different way of working than previous years. In

It is very clear worldwide more than 1.5 billion students have been affected and the ongoing legacy of the impact of COVID for students could not be underestimated

higher education, they were equally forced to make rapid changes for academic assessment, and this will affect the labour market as well, where jobs are vanishing rapidly.

The onset of Covid has augmented integration of digital teaching and enriched the current system which will help a proportion of the students who can access it appropriately and accept this as a New-Normal. However, there are real concerns about those who have not been fortunate enough to access digital technology. This is mostly due to inequality and unfairness of the system. They neither have the appropriate tools, nor do they have the socio-economic & cultural understanding of the families to how to navigate through the systems to help them for education. As educationalist and teachers, who would provide education for future generation, we need to be mindful of the effect of COVID to be different in each student depending on their socio-economic background and circumstances of home which would affect in their learning & education. How they would flourish in future will depend on our support and I hope we can give them the comfort and compassion to ensure that least we can recognise the need and do our little bit to help for each individual student.

All crisis ends and so will COVID-19 pandemic. There is always Hope. Vaccines are out and I hope we will see a better spring in 2021. Lastly, I am thankful to all my teachers for their input in my journey life and I offer my sincere respect to the departed souls of the Teachers and Medical service workers we lost during this year.

Reference:

Association of Colleges, College Key Facts 2019-2020 (2020). London: AoC – https://www.aoc.co.uk/sites/ default/files/AoC%20College%20Key%20Facts%20 2019-20.pdf

Association of Colleges, Covid-19 and Colleges. AoC's early summer survey (May 2020). London: AoC – https://www.aoc.co.uk/sites/default/files/AoC%20 Covid19%20and%20colleges%20survey%204.5.20. pdf

Pember, S. and Corney, M, Post-16 Education. Planning for a very different September. Discussion Paper (15 April 2020). Newcastle: NCFE, London: CfL – https://www.ncfe.org.uk/media/2614/covid-19- discussion-paper.pdf

Goodhart, D, A training opportunity in the crises. How the Covid-19 response can help sort out Britain's training mess (May 2020). London: Policy Exchange – https://policyexchange.org.uk/publication/a-trainingopportunity-in-the-crisis/

The Impact of Covid-19 on Education A summary of evidence on the early impacts of lockdown- The Edge foundation June 2020

* Article written on 30.12.2020

Cancer Prevention

Dr. Tanmoy Mukhopadhyay

Cancer is the second leading cause of death globally, accounting for an estimated 9.6 million deaths or one in six deaths, in 2018. Research shows that up to 50% of cancer cases and about 50% of cancer deaths are preventable with the knowledge we have. Prevention and early detection are more important than ever. According to American Cancer Society, there is strong evidence that an individual's risk of developing cancer can be substantially reduced by healthy behaviour.

STEPS TO PREVENT CANCER & REDUCE OUR RISK

Don't use tobacco

Using any type of tobacco puts anyone on a collision course with cancer. Smoking has been linked to various types of cancer- including cancer of the lung, mouth, throat, larynx, pancreas, bladder, cervix and kidney. Chewing tobacco has been linked to cancer of the oral cavity and pancreas. Even if you don't use tobacco, exposure to secondhand smoke might increase your risk of lung cancer. Avoiding tobacco or deciding to stop using it – is an important part of cancer prevention. It is never too late to quit. About 90 percent of all lung cancers is related to smoking.

Protect your skin from the sun

Exposure to the sun's ultraviolet radiation causes most skin cancer. Avoid midday sun- Stay out of the sun between 10am. and 4pm when the sun's rays are strongest. Avoid unnecessary exposure to radiation. Get medical imaging studies only when you need them. To help prevent skin cancer while still having fun outdoors, protect yourself by seeking shade, applying sunscreen and wearing sun-protective clothing, a hat and sunglasses.

Eat lots of fruits, vegetables, beans and whole grains. Limit red meat and cut out processed meat. If you choose to drink alcohol, do so only in moderation. Excess alcohol increases the risk of cancers of the mouth, larynx (voice box), esophagus (food pipe), liver and colon; it also increases a woman's risk of breast cancer. The risk of various types of cancer increases with the amount of alcohol you drink and the length of time you have been drinking regularly. Smoking further increases the risk of many alcohol-induced malignancies.

Eat a healthy diet

Adults who participate in any amount of physical activity gain some health benefits. But for substantial health benefits, strive to get at least 150 minutes a week of moderate aerobic activity or 75 minutes a week of vigorous activity. As a general goal, include at least 30 minutes of physical activity in your daily routine and if you can do more, even better. Inactivity and obesity have been linked to breast and colorectal cancer, and there is also some evidence of a link to lung, pancreatic and possibly reproductive cancers in women.

Maintain a healthy weight & be physically active

Avoid risky behaviours

Avoid infections that contribute to cancer, including Hepatitis B virus (HBV), HIV and Human Papilloma Virus (HPV). Many are transmitted sexually or through contaminated needles.

Certain viruses have been linked to cancer, but are preventable through vaccination. The human papillomavirus (HPV) vaccine helps prevent most cervical cancers and several other kind of cancer. The hepatitis B vaccine help lower liver cancer risk. HPV vaccination is recommended for preteens aged 11 to 12 years, but can be given starting at age 9. Hepatitis B vaccine is available for all age groups to prevent HBV infection.

Get immunized
HPV & HEPATITIS VACCINES

Some tests can help detect cancer early, when treatment is more likely to be successful, and some can also detect precancerous conditions before they become cancer. While screening has been proven to save lives, screening guidelines aren't always "one size fits all". Getting screening tests

regularly may find breast, cervical and colorectal (colon) cancers early, when treatment is likely to work best. Lung cancer screening is recommended for some people who are at high risk. Mammograms are the best way to find breast cancer early, when it is easier to treat. The Pap test can find abnormal cells in the cervix which may turn into cancer. The HPV test looks for the virus (human papillomavirus) that can cause these cell changes. Pap tests also can find cervical cancer early, when the chance of being cured is very high. Colorectal cancer almost always develops from precancerous polyps (abnormal growths) in the colon or rectum. Screening tests can find precancerous polyps, so they can be removed before they turn into cancer. Screening tests also can find colorectal cancer early, when treatment works best. The USPSTF recommends yearly lung cancer screening with low-dose computed tomography (LDCT) for people who have a history of heavy smoking and smoke now or have quit within the past 15 years and are between 55 and 80 years old. Screening for ovarian, pancreatic, prostate, testicular and thyroid cancers has not shown reduction of deaths from these cancers. Screening tests can help detect malignancies at the earliest stages, but you should always be alert for symptoms of disease. The American Cancer Society developed this simple reminder years ago:

Get regular cancer screenings

C	Change in bowel or bladder habits
A	A sore that does not heal
U	Unusual bleeding or discharge.
T	Thickening or lump in the breast or elsewhere
I	Indigestion or difficulty in swallowing.
O	Obvious change in a wart or mole.
N	Nagging cough or hoarseness

It's a rough guide at best. The vast majority of such symptoms are caused by nonmalignant disorders, and cancers can produce symptoms that don't show up on the list, such as unexplained weight loss or fatigue. But, it is a useful reminder to listen to your body and report sounds of distress to your doctor.

২০২০ বর্ষে অরণ্য সপ্তাহ পালন

বৃক্ষরোপণ (২০২০) চলছে

কবিতা

কথা

শ্রী মৃন্ময় সমীরণ নন্দী

শুধু কথাতেই মানুষগুলো আছে।
দেখি তাদের প্রতিদিন আমার চারপাশে,
বসে, গল্প করে--
সেখানেই শিরদাঁড়া সোজা, সেখানেই পরের জন্য
আত্মবলিদান।

কিন্তু বাস্তব চেহারাটা অন্যরকম, অন্য রূপ, অন্য কথা-
একেবারে ঘুণধরা কাঠ, আপাদমস্তক ফাঁপা।
লক্ষ্মণরেখায় গন্ডি দিয়েছে নিজেকে, বেঁধেছে আষ্টেপৃষ্ঠে,
সেখানেই তাদের সম্পূর্ণ পৃথিবী, সেখানেই তাদের জীবন।
যা কিছু করা নিজের জন্য, যা কিছু ভাবা নিজের জন্য।

এর বাইরে যদি কিছু করতে হয় কারোর জন্য-
তার জন্য সুন্দর ভাষা আছে জিহ্বার অগ্রভাগে,
খরচ যদি কিছু করতে হয়, তাহলে সেটা কেবল মাত্র শব্দ-
নানা রঙ -- নানা বর্ণ।
মনুষ্যত্ব- নাই বা থাকলো সেখানে।

মৃত্যু

শ্রী মৃন্ময় সমীরণ নন্দী

এলো সে অবশেষে --
এলোমেলো করে দিল ঘর সংসার।
এ কোনো ঝড় নয়, এ কোনো ঝঞ্ঝা নয়,
এ অদেখা অদৃশ্য অশরীরী এক সত্য রূপ, যাকে
জীবনের মাঝখানে বসিয়ে পথ হাঁটতে হয় প্রতিটি
মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে।
অকস্মাৎ তার আবির্ভাবে ঘোর অন্ধকার নামে
চোখে।

যে ছিল কাছে, যে ছিল মুখর, সে সহসা নিভে
যায় দপ করে।
এই সত্য চিরসত্য যা অদৃশ্য আমাদের অজ্ঞানতার
কারণে।
স্নেহ-ভালোবাসা, হাসি-গান, যা ফুলের মতো
বিকশিত এই জীবনের মাঝখানে,
সে সব ঝরে পড়ে দিন শেষে।

অবাস্তব

শ্রী মুরারি চক্রবর্তী

এমন একটা স্বপ্ন দিতে পারো -
যেখানে
মুখোশ পরা রাজা নেই,
মিথ্যে ভরা ভাষণ নেই,
জাতের নামে বজ্জাতি নেই,
নাটক করা রাণী নেই,
মতপ্রকাশে বাধা নেই,
নেপোর যেথায় হয়না পোয়াবারো।

এমন একটা স্বপ্ন দিতে পারো -
যেখানে
জাতির নামে ঐক্য আছে,
রাম রহিমের বাঁধন আছে,
সব ঘরেতে হাসি আছে,
স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন আছে,
রাজা প্রজায় মিলন আছে,
কেউ ছোটো নয়,
সবাই সেথায় বড়ো।

উপলব্ধি

ডঃ অর্ঘ্য মজুমদার০

ও মা পড়ে যাবো গো, পারছিনা গো নিচে নামতে
পৌঁছেছি আমি শিখর, জানি না গো থামতে।।
পিছনে ফেলেছি আমি সবাইকে যেন আজ
ঘাড় ধাক্কা, ছুরিকাঘাতেও করিনি তেমন লাজ।।
বড়ো হবো, রাজা হবো, এই ছিল আমার স্বপ্ন
সেরার সেরা হবো, করেছিলাম আশা বপনও।।
কি যে হলো, হলো আশা আমার যে চুরমার
ভাঙলো ঘুম, সোনালী স্বপ্ন, আজ সব ছারখার।।
নিজেকে নিয়ে ভাবনা ছিল, ছিলোনা কিছু আর
বন্ধু, তোর চিন্তা, সময় ছিলোনা রে আমার।।
ঘুম ভাঙলেও, পারছি না আমি তোকে কাছে ডাকতে
ফিরতে চাই পুরোনো দিনে, চাই যে আমি বাঁচতে।।

চাই যে আমি নিতে, আমার ভুল শুধরে
ফিরিয়ে দে না সেই সুখ, নিস না তুই উপড়ে।।
কর না আদর আমায় একটি বারের জন্য
Dear please কাছে আয়, কররে আমায় ধন্য।
তোর কাছে পাতছি আমি, দুই হাত আমার
ক্ষমা কর, কাছে টান, তোকে ছুঁই একটিবার।
ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত আমি, বলছি সব ভুলে
বন্ধু আমার কাছে আয়, কথা বলি মন খুলে।।
গলা ছেড়ে বলি আমি, বন্ধু প্রিয়জন সবাই
খ্যাত হবি, বড় হবি, হবি স্বজন ছাড়াই।।
চাস কিনা বড় হতে, ভাবিস আগে মনে
খ্যাতির শিখরে উঠলেও তুই মরবি মনে প্রাণে।।

অপেক্ষায় আছি

শ্রী দেবাশীষ হোড়

গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো কিছু মানুষ পথ ধরে হেঁটে চলেছে,
এদের মধ্যে কেউবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি অন্যের কাছে বন্ধক রেখেছে,
কেউবা মৌনব্রত ধারণ করে আজীবন কাটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিনি সুতোর মালায় এরা একে অপরের সাথে আবদ্ধ।
সামাজিক কোনো অন্যায়-অবিচার এদের শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি করেনা।
অন্তরের অকৃত্রিমতাকে বিসর্জন দিয়ে এরা কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।
আত্মকেন্দ্রিকতায় ভরপুর হয়ে এরা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ভুলতে বসেছে।
কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থতাই এদের জীবন-আদর্শ।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সৃজনশীলতা তলানিতে ঠেকেছে
অপসংস্কৃতির আভরণে সজ্জিত হয়েছে শিক্ষাঙ্গন
এভাবে চলতে থাকলে মানব সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।
এখনো সময় আছে, জাগো বন্ধু জাগো।
নিজেকে এভাবে বিকিয়ে দিও না দুষ্কৃতিদের হাতে
নিজের অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটিয়ে তুমি প্রমাণ করো, তুমি নিষ্প্রাণ নও।
ফুলের সৌরভ তোমাকে এখনো কী মোহিত করেনা?
পাখির কলকাকলিতে প্রাণটা চঞ্চল হয়ে ওঠেনা?
নীল আকাশের স্নিগ্ধতা তোমাকে কী বিচলিত করেনা?
তাহলে কেন তুমি অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে মুখ বুজে?
বিবেক দংশনের আত্মগ্লানি কেন সইবে প্রতিবাদহীন হয়ে?
তুমি হলে সেই দীপশিখা, যার জাগরণে ঘুচবে তমসার আবরণ

সমাজ-সংসার সচেতনতায় ভরপুর হবে
শূন্য হবেনা কোনো দুখিনী মায়ের কোল
রাজনীতির বাদশারা গোলাম বানাতে পারবে না কোনো শিক্ষিত বেকারকে
খুন-জখম-ধর্ষণ-দাঙ্গা থেকে মুক্তি পাবে সমাজ
নতুন দিনের সূর্যে আকাশের কালিমা ঘুচে যাবে,
অপেক্ষায় আছি সেই সুদিনের।

My Neighbour

Shri Debajyoti Ray

Alone, in my modest balcony,
Prisoned by grilled fences around,
I feel forsaken by all my loving neighbours.
No morning salutation greets me anymore,
No loving queries from my friends next door,
Their casual visits shunned as acts of treason.

The fierce frown of the deadly virus reigns supreme
Leaving a trail of havoc on the placid life;
The unknown, fathomless fear of death
Enslaves one and all within the four walls,
Mortally threatened by the Devil's fury.
No more do I listen to the loud calls
From my dear neighbours with brotherly love.

Lazily, silently to my bed confined; in my slumber
I hear a strange entity hissing into my ear.
Vaguely I stare at my unsolicited visitor –
A tall slim shape – no face, no head, no limbs,
But in a long verdant garb, beckoning me afar.

At the dawn, leaving behind my bed of boredom,
I walk along, till I reach my pleasant garden,
And then, take my strange visitor in firm embrace –
My young Pine tree, my most trusted neighbour,
Standing strong against threats of Storm and tremor.

A few dew-drops fall on my brightened face;
I hear my sweet neighbour cooing in my ears –
"My tears of love, good friend"!

Love birds

Dr Arghya Majumder

We love each other, we don't know why?
May we live here, May together die?
Holding each other's hand, worth lifetime
Stars are bright, night plays chime.

I don't wanna live without you, oh dear!

Your kisses are sweet, smell like rose
Can feel you inside me keeping eyes close
Stay close, near me, don't go away
Love is in the air, feel it as you may.

Living without you is a complete no no, oh dear!

I am the one, as you found out me
Days gone, years passed, time fled, not me
No matter what happens, I stay
Won't leave you now, come what may.

Being close to you, has become my life, oh dear!

খেলাধূলা

বসিরহাটের বরেণ্য ফুটবলাররা

শ্রী কালিদাস মজুমদার

খেলাধূলার ক্ষেত্রে বসিরহাট মহকুমার একটি দীর্ঘকালীন ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য যাঁদের কৃতিত্বে গড়ে উঠেছে, আলোচ্য নিবন্ধ কেবলমাত্র সেই ফুটবল খেলোয়াড়দের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস। এই নিবন্ধ নিজ স্মৃতি-নির্ভর। স্বাভাবিকভাবে কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। নিজ অজান্তে কোনও খেলোয়াড়ের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। সেই জন্য পূর্বাহ্নে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। তার সাথে সাযুজ্য রেখে আমাদের শহরেরও সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ইংরেজরা ১৯০ বছর আমাদের শাসন করলেও অনেক কিছু দিয়েছে, যার অন্যতম এই চর্মগোলকটি যা 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। মূলতঃ বসিরহাট মহকুমার ফুটবল খেলা আবর্তিত হয়েছে বসিরহাট শহর, টাকি শহর, বাদুড়িয়া, শিকড়া কুলীনগ্রাম, ধান্যকুড়িয়া এবং হাড়োয়াকে কেন্দ্র করে।

টাকি থেকে শুরু করা যাক। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই শহরের যথেষ্ট কৌলিন্য আছে। এখানে রয়েছে সরকারী কলেজ, সরকারী স্কুল, সরকারী গ্রন্থাগার এবং রামকৃষ্ণমিশন স্কুল। রামকৃষ্ণমিশন স্কুল ছাড়া বাকিগুলি গড়ে উঠেছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সৌজন্যে। টাকির খেলাধূলার নেপথ্যে রয়েছে শতবর্ষ অতিক্রান্ত ঐতিহ্যমন্ডিত টাকি এরিয়ান ক্লাব। এই বর্ণময় ক্লাবটি অসংখ্য খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে মহকুমা তথা রাজ্য তথা দেশের ফুটবলে।

আমাদের জীবনে দেখা টাকির অগ্রজ খেলোয়াড় সরোজ চ্যাটার্জী (বড়দা)। বিগত শতকের চারের দশকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও তিনি কলকাতা লীগে প্রথম বিভাগে ফুটবল খেলেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরল কুমার, তপন কুমার, ভাইটিনদা কলকাতায় খেলেছেন বি. এন. আর দলের হয়ে। গোপাল মুখার্জী দুর্ভেদ্য ব্যাক ছিলেন। এঁদের কিছু পরে উঠে আসেন বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী (বিষ্টুদা)। দ্রুতগতিসম্পন্ন দুর্দান্ত রাইট উইংগার ছিলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর এবং আমাদের, যখন কলকাতা ময়দানে নিজেকে মেলে ধরছেন সেই সময় তৎকালীন মহামেডন গোলরক্ষক আহমেদ আখতারের সাথে সংঘর্ষে তাঁর হাঁটু গুঁড়িয়ে যায় এবং এক অসাধারণ সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের জীবনে অকালে দাঁড়ি পড়ে যায়। আমার খেলার মাঠের গুরু রবীন সেনগুপ্ত (ঘ্যাসদা) বলেছিলেন যে বিষ্টুদার দুর্ঘটনা না ঘটলে প্রদীপ ব্যানার্জীকে চ্যালেঞ্জ জানাতেন। জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা ছিল তাঁর। কয়েকবছর পরে উঠে আসেন নীলেশ সরকার। কলেজ ফুটবলে হ্যাটট্রিকের বন্যা বইয়ে দিয়ে তাঁর উত্থান। বালিপ্রতিভা থেকে উঠে আসা নীলেশদা ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, বাংলা দল হয়ে জাতীয় দলে খেলেছেন। অসম্ভব ভালো পজিটিভ স্ট্রাইকার ছিলেন। ১৯৬৪-৬৫ নাগাদ উঠে আসে মানস ব্যানার্জী। বর্ন অ্যাথলিট মানস অত্যন্ত দ্রুত গতির রাইট উইংগার ছিল। তখন নামী এরিয়ান ক্লাব ও বাংলার রাজ্য দলে খেলেছে। কিন্তু সুকুমার সমাজপতির ছায়ায় ঢাকা পড়ে জাতীয় দলের দরজা সে খুলতে পারেনি। পরবর্তীকালের সেরা প্রোডাক্ট অনুদেব দাস। টালিগঞ্জ অগ্রগামী, ইষ্টবেঙ্গলে খেলা অনুদেব বাংলা রাজ্য দল ও জাতীয় দলের স্টপার ব্যাক ছিল।

কাছাকাছি সময়ে টাকি এরিয়ান থেকে এক ঝাঁক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসে। শরদিন্দু ব্যানার্জী, তপন বিশ্বাস, ভবসিন্ধু গোল, মেঘনাদ ব্যানার্জী, গৌরমোহন সরকার, স্বপন বিশ্বাস এবং নীতিন ব্যানার্জী। নীতিন দুর্দান্ত গোলকীপার ছিল। প্রচন্ড সাহসী ছেলেটি নীচের বলে দুর্ভেদ্য ছিল। সোনালী শিবির দলে খেলত। অধিনায়কও হয়েছিল। তপন বিশ্বাস ছিল মাঝ মাঠের এক শিল্পী। সুদর্শন, সুভদ্র এই খেলোয়াড়টির পায়ে বল কথা বলত। বি. এন. আর দলের নিয়মিত খেলোয়াড়টি অল-ইন্ডিয়া রেলে খেলেছে এবং বি. এন. আর দলের অধিনায়কও হয়েছিল। বল কন্ট্রোল, তীক্ষ্ণ ডজ এবং মাপা পাস তার খেলাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিল। সুচারু এই ফুটবলার আরো বড়ো দলে খেলার যোগ্যতা রাখত। ভবসিন্ধু স্টপারে ছিল জিব্রাল্টার পাহাড়ের মতো। দুপায়ে শট, নিখুঁত হেড এবং হার না মানা মনোভাবে সে ছিল এক অসাধারণ খেলোয়াড়। স্বপন বিশ্বাস ছিল দুর্দান্ত স্ট্রাইকার। তীব্র গতি, অনুমান শক্তি এবং জোরালো শট তাকে স্থানীয় এলাকায় প্রভূত খ্যাতি দিয়েছিল। শরদিন্দু ব্যানার্জী দুরন্ত মিডফিল্ডার ছিল। দুপায়ে ছিল চমৎকার ডজ। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছিল। গৌর সরকার খুব টাফ্ গতিশীল উইং ব্যাক ছিল। মেঘনাদ ব্যানার্জী খুব ভালো স্টপার ছিল এবং স্বাভাবিক অ্যাথলিট হওয়ায় দুর্দান্ত স্পট জাম্প ছিল। সঞ্জয় মুখার্জী রক্ষণে অনবদ্য ছিল। হাওড়া ইউনিয়নে খেলত। সমর মুখার্জী ভালো গোলরক্ষক ছিল। আর এক প্রতিভাবান ফুটবলার ছিল বিশ্বজিৎ পাল। উইংগারে একটু বেশী সাবলীল হলেও মিডফিল্ডে ও রক্ষণে সে ছিল অনবদ্য।

হাসনাবাদের নদী পার হয়ে দুই অসাধারণ খেলোয়াড় খেলতে আসতো বসিরহাটে। ছয়ের দশকে মহকুমার সর্বকালের অন্যতম সেরা স্টপার ব্যাক ছিল মমতাজ। ঐ সময়ে বিনা কোচিং-এ সে আধুনিক ফুটবল খেলেছে। অসাধারণ ড্রিবল, প্রচন্ড অনুমান শক্তি, দারুণ হেড, দুপায়ে শট ছিল তাঁর। এখনকার নিরিখে জাতীয়মানের খেলোয়াড় ছিল বরুণহাটের মমতাজ। ঐ এলাকার আর এক শিল্পী ফুটবলার আফসার। যেমন দুটি সোনা বাঁধানো পায়ের ডজ, তেমনই হেড, ঠিকানা লেখা পাস। আমার দেখা অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। হাসনাবাদের রণজিৎ গায়েনও খুব ভালো ফুটবলার ছিলেন। কিছু পরে উঠে আসে মিহির দাস ও চিত্ত মন্ডল। মিহির দাস বি. এন. আর দলে খেলত। বোলতলার চিত্ত পজিটিভ স্ট্রাইকার ছিল। বুলডোজারের মতো রক্ষণ ভেঙে ঢুকে পড়ত।

হাড়োয়ার কৃতীদের নাম করতে গেলে প্রথমেই আসবে দুই ভাই বাচ্চু মিঞা ও সাচ্চু মিঞা। স্থানীয় এলাকায় অনবদ্য খেলতেন তাঁরা। যোগাযোগের অভাবে কলকাতায় খেলতে পারেননি। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি উঠে আসে গোলরক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী। দীর্ঘদেহী গোলরক্ষক উপরের বলে ছিল অপ্রতিরোধ্য। কলকাতাতেও সে খেলত, তবে খাদ্যদপ্তরের অফিসার হওয়াতে একটু তাড়াতাড়ি সে খেলা ছেড়ে দেয়। ওর ভাই অমিতাভও ভালো খেলোয়াড় ছিল। কয়েক বছর পরে মাঝ মাঠে এক শিল্পী ফুটবলার উঠে আসে, তার নাম মুকুল মিঞা। প্রায় সমসাময়িক স্বদেশ সেন এক কৃতী স্টপার ছিল। যতদূর মনে পড়ছে, ইষ্টবেঙ্গলে ও খেলেছে। রাজ্য দলে খেলেছে এবং জাতীয় দলে রিজার্ভ ছিল। অরুণ দত্ত খুব উচ্চমানের স্টপার ছিল। হাড়োয়ার সেরা প্রোডাক্ট রিয়াজুল মুস্তাফা। অনেকদিন মহামেডানে খেলা রিয়াজুল জাতীয় দলে খেলেছে স্টপারে। এদের জুনিয়র আফজল আহমেদ খুব ভালো ফরোয়ার্ড ছিল। এরিয়ান ও মহামেডান এ. সি. তে খেলেছে।

ধান্যকুড়িয়া থেকে অনেক ভালো ফুটবলার এসেছে। ভূপাল বসু খুব ভালো গোলরক্ষক ছিলেন। দেবদাস মন্ডলের হেড ছিল অসাধারণ। খুব ভালো সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। মদনদাস মন্ডল ছিলেন মাঝ মাঠের এক অনবদ্য খেলোয়াড়। তুষার পান্ডি মহকুমার অন্যতম সেরা স্টপার ছিল। অনবদ্য ট্যাকল ছিল। প্রদীপ সমাদ্দার (হারু) দুর্দান্ত উইংগার ছিল। কাঞ্চন গাইন যেকোনও দলের সম্পদ ছিল। সব পজিশনে খেলেছে গোল ছাড়া। ভীষণ প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী ছিল। লুৎফর রহমান খুব ভালো স্ট্রাইকার ছিল। অলোক মন্ডল প্রতিভাবান লেফট উইং ছিল, তবে ধান্যকুড়িয়া তথা মহকুমার অন্যতম সেরা ফুটবলার ছিল উৎপল মন্ডল। মহামেডন স্পোর্টিং ও বাংলা রাজ্য দলে খেলেছে এই শিল্পী ফুটবলার। এই এলাকার বিবিপুর থেকে উঠে এসেছিল নাজিমুল হক। ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডানে খেলা এই স্ট্রাইকার বাংলা রাজ্য দলেও খেলেছে। মনীশ গায়েন দারুণ সাইড ব্যাক ছিল। কুলীনগ্রামের কালিপ্রসাদ মুখার্জী অনবদ্য ডিফেন্ডার ছিলেন।

বাদুড়িয়া থেকে অসংখ্য ফুটবলার উঠে এসেছে। অগ্রজ হিসাবে উল্লেক্ষ্য ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, খোকা মোল্লা, ডাঃ মোশারফ হোসেন, তারকচন্দ্র ঘোষ ও সন্তোষ কুমার দাসের নাম। খোকাদা অসাধারণ মাঝ মাঠের খেলোয়াড়। তাঁর খেলায় শিল্পের ছোঁয়া ছিল। পাঁচের দশকে উঠে আসেন শ্যামল সরখেল, শচীনন্দন মন্ডল, দ্বিজেন মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সময়ের সেরা খেলোয়াড় অমিয় চক্রবর্তী। ছয়ের দশকের শেষে ও সাতের দশকের শুরুতে উঠে আসে দুই ভাই নওশাদ আহমেদ ও নাসির আহমেদ। নওশাদ দুর্দান্ত স্টপার ছিল। এখনকার দিনে জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা রাখত। নাসির আহমেদ মহকুমার সর্বকালের সেরা গোলরক্ষক। কোলকাতার তিন প্রধানে খেলা ছাড়াও রাজ্য দলে খেলেছে এবং জাতীয় দলে স্ট্যান্ডবাই ছিল। সৌজন্যবোধে অতুলনীয় ছিল। পরবর্তী কালে উঠে আসে অশোক চৌধুরী (বাদল)। টালিগঞ্জ অগ্রগামী ও

ইষ্টার্ন রেলে খেলেছে। সমসাময়িক তাহেরুল আলম (টিঙ্কু) ভাল স্ট্রাইকার ছিল। বিজয় দাস (বাবু) অসাধারণ স্টপার ছিল। ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড়টি পুলিশ দলে খেলত। সুকল্যাণ মুখার্জী (রাজা) বেহালা এ. সি. দলে খেলত। ওয়ালিয়র আহমেদ (সাচ্চু) জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহামেডান এ.সি. তে খেলেছে।

ফুটবলের ক্ষেত্রে বসিরহাট শহর অনন্য। দেশের হয়ে খেলা অনেক খেলোয়াড় রয়েছেন এখানে। তবে সুযোগের অভাবে ফুটবলের মক্কায় না খেলেও অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়ের মধ্যে স্মরণীয় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (মেজ কেলোদা), নির্মল ঘোষ (ভেজালদা), নির্মল বসু (নীলুদা) ও ভরতচন্দ্র নাথ। কাছারীপাড়ার নির্মল বসু রক্ষণে অনবদ্য খেলোয়াড় ছিলেন। ভরতচন্দ্র নাথ খুব উচ্চমানের গোলরক্ষক ছিলেন।

বাম থেকে ডানঃ মিহির বসু, বিক্রমজিৎ দেবনাথ এবং লেখক
সৌজন্যেঃ লেখক

অলোক দাস
সৌজন্যেঃ The Telegraph Online

মহকুমার সর্বকালের সেরা ডিফেন্ডার আমার মতে যুগ্মভাবে বিক্রমজিৎ দেবনাথ ও অলোক দাস। বিক্রমদা তিন প্রধানে খেলা ছাড়া রাজ্য ও জাতীয় দলের স্তম্ভ ছিলেন। খুব কড়া ট্যাকল ছিল তাঁর। অলোক দাস কলকাতার তিন প্রধানে খেলা ছাড়াও মুম্বাই ইউনাইটেডে খেলেছে। রাজ্য ও জাতীয় দলের নির্ভর যোগ্য ডিফেন্ডার ছিল। জাতীয় দলের অধিনায়কত্বও করেছে এই দীর্ঘদেহী সুদর্শন ফুটবলার। মুন্সেফপাড়ার কামাখ্যাদা (চ্যাটার্জী) ইংল্যান্ডে তৃতীয় ডিভিশনে খেলেছেন। দুর্দান্ত উইংগার ছিলেন। রবীন সেনগুপ্ত (ঘ্যাসদা) মহকুমার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাজ্যের অন্যতম সেরা ফুটবল প্রশিক্ষক ছিলেন। রেল দলের হয়ে ন্যাশনাল খেলেছেন। বাঁ পা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধানো। মিহির

বসু, নাসির আহমেদ, অলোক দাস, দীপেন্দু বিশ্বাস সবাই তাঁর ছাত্র। দারুণ ম্যাচ রিডিং ছিল। মিলন সংঘ ও প্রান্তিকের উন্নয়নে তাঁর অসাধারণ ভূমিকা ছিল।

ইটিন্ডার আবদার রহমান দারুণ সাইড ব্যাক ছিলেন। বিমল হালদার খুব উচ্চমানের উইংগার ছিলেন। বসিরহাটের অন্যতম কিংবদন্তী কিন্তু কলকাতায় সুযোগ পেয়েও যাননি। হরেন্দ্রনাথ ঘোষ খুব ভালো সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। অমিয় মল্লিক (তাবুলদা) উচ্চমানের গোলরক্ষক ছিলেন। আশীষ রায়চৌধুরী (নীলুদা) জর্জ টেলিগ্রাফে ফরোয়ার্ড ছিলেন। ভ্যাবলার দ্বীপেন গাঙ্গুলী (অলাদা) খুব ভাল স্টপার ছিলেন। মিলন দালাল ও সরল চক্রবর্তী খুবই উচ্চমানের হাফ্ ছিলেন।

কিছু পরে উঠে আসে নির্মল ঘোষ। দেবদত্ত প্রতিভা ছিল এই শিল্পী ফুটবলারের। ১৯৬৮ সালে বি. এন. আর দলে চার ম্যাচে তিন গোল করেছিল। অ্যান্টনি, আপ্পালারাজু, ভারালু ও রাজেন্দ্র মোহনের পাশে ইনসাইডে খেলত। ঐ বছর ৭ই নভেম্বর বরুণহাটে ফুটবল খেলার সময় আহত হয়ে অকালে জীবনদীপ নিভে যায় এই খেলোয়াড়টির। সমকালীন সুধীর দাস পোর্ট কমিশনার্স দলে খেলত। খুবই দক্ষ স্ট্রাইকার ছিল। সুধীরের সাথে খেলত মাধব দাস ও অজয় মুখার্জী। দুজনেই দুর্দান্ত ব্যাক ছিল। একই দলে কৃষ্ণ মজুমদার, তার ভাই গোপাল মজুমদার, চন্ডীচরণ ঘোষ, তপেশ হালদার, অমরেশ হালদারও (নীতু) খেলত। সেন্টার হাফে কৃষ্ণ ছিল অনবদ্য। মাপা কর্ণার কিক করত। তার ও নির্মল ঘোষের দুর্দান্ত বোঝাপড়া ছিল। তাদের যুগলবন্দী অনেক ভালো গোল উপহার দিয়েছে। হাফে গোপাল মজুমদার লা জবাব। মহকুমার অন্যতম সেরা বল প্লেয়ার। চন্ডী গোলে নির্ভরতা দিত। এক একদিন মনে হত তার হাত বোধ হয় ঈশ্বরের হাত। অমরেশ খুবই প্রতিভাবান ছিল। দুপায়ে সমান ডজ, প্রচন্ড শট এবং বল কন্ট্রোল ছিল। গতি ও শক্তি মিশেলে এক কমপ্লিট ফুটবলার। টালীগঞ্জ অগ্রগমীতে খেলত।

তপেশ হালদার ভাল স্ট্রাইকার ছিল। এ সময়ের তিন সেরা গোলরক্ষক ছিল বীজেশ সরকার, বসন্ত বাছাড় এবং প্রদ্যোৎ ঘোষ। বীজেশ অসামান্য প্রতিভাবান ছিল কিন্তু তার প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। নাসিরের পরে সে-ই বসিরহাটে সেরা। বসন্ত বাছাড় অসম সাহসী গোলরক্ষক ছিল। উচ্চতা কম হলেও দুরন্ত স্পট জাম্পে ঘাটতি মিটিয়ে নিত। প্রদ্যোৎও বড় মাপের গোলরক্ষক ছিল। যখন ফর্মের তুঙ্গে তখন বসিরহাট থেকে চলে যায়। সমসাময়িক সুভাষ ধর এক অসামান্য বল প্লেয়ার ছিল। ফরোয়ার্ড এবং মাঝ মাঠের অনবদ্য প্লেয়ার ছিল। গোবিন্দ মল্লিক (সবুজ সংঘ) দুরন্ত লেফট উইং ছিল। বিশ্বনাথ মুখার্জী (মিন্টু) চমৎকার হাফ ও ফরোয়ার্ড ছিল। সব খেলায় পারদর্শী ছিল। খগেন দাস একজন দুরন্ত ডিফেন্ডার ছিল। পায়ে ছিল লম্বা ৬০/৭০ গজের শট।

মিহির বসু
সৌজন্যেঃ মিহির বসু-র ফেসবুক পেজ

এদের কিছু পরে আসে মিহির বসু। মহকুমার সর্বকালের সেরা ফরোয়ার্ড। পোর্ট ট্রাস্ট, বি. এন. আর ঘুরে ১৯৭৭-এ ইষ্টবেঙ্গলে আসে এবং ভিনি, ভিডি, ভিসি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তার গোল ইতিহাস হয়ে গেছে। বাংলা রাজ্য দল এবং জাতীয় দলে অনেকদিন খেলেছে। পায়ে ছিল গোলার মত শট এবং টিম ম্যান ছিল। কর্তাভজা না হওয়ায় ১৯৮৬-র এশিয়াডে দল থেকে বাদ পড়ে। নির্লজ্জ নমুনা ফুটবল কর্তাদের। মিহির পরে কোচ হয় এবং ভেটারেন্স ক্লাবের বড় কর্মকর্তা। মিহিরের সময়ে উঠে আসে কল্যাণ মুখার্জী। প্রচন্ড ফিটনেস ছিল, ট্যাকল ছিল অনবদ্য। আগ্রহের অভাবে কলকাতায় খেলতে পারল না। আমার দেখা মহকুমার অন্যতম সেরা স্টপার ব্যাক। এই সময়ে রক্তিম বসু দুরন্ত ফরোয়ার্ড

ছিল। মস্তিষ্ক দিয়ে খেলত। রাইট উইং-এ বিমল ঘোষ অনবদ্য ছিল। স্টপারে দিলীপ ভট্টাচার্য, উদয়াদ্রি ভট্টাচার্য (দীপুদা), ফরোয়ার্ডে প্রবীর বসু (গোরা), লেফট উইং-এ শ্রীকুমার হালদার অনবদ্য ছিল। এদের পরে দুই প্রখ্যাত স্টপার সুভাষ চন্দ্র ও গৌতম ভট্টাচার্য (বাপি), দুজনেই দক্ষ হেডার এবং জোরালো শটের অধিকারী ছিল।

এদের আগে মিডফিল্ডে নাম করেছিল ত্রিদিব ব্রহ্ম। সে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ছিল। সমীর বসু খুব ভালো মিডফিল্ডার ছিল। এখন প্রশিক্ষক। অরুণ ঘোষ (অপু) নামী মিডফিল্ডার ছিল। পরে N.I.S করে কোচ হয়। অসম রাজ্য দলের কোচ ছিল। সন্ময় বসুও (বোতান) খুব চমৎকার মিড ফিল্ডার ছিল। N.I.S করে ওড়িশা রাজ্য দলের কোচ ছিল। সুদীপ্ত পালিত দুর্দান্ত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ছিল। নারায়ণ দত্ত ছিল খুব ভাল মিডফিল্ডার। স্বপন সরকার (পচা) দুর্দান্ত স্ট্রাইকার ছিল। সমীর বিশ্বাস (হোলা) মহকুমার অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার ছিল। অঞ্জন দাস খুব ভাল গোলরক্ষক ছিল। চাকরীর সুবাদে অসমে গিয়ে বেশ নাম করেছিল। কাছাকাছি সময়ে উঠে আসে সুকোমল বসু। খুবই ভালো গোলরক্ষক। দারুণ গ্রিপিং ছিল। পরবর্তীতে আমার দেখা সেরা গোলরক্ষক স্বপন বিশ্বাস। যেমন আউটিং, গ্রিপিং, তেমনি ফিটনেস।

অমিতাভ নন্দী (মিন্টু) খুবই উচ্চমানের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ছিল। দেবব্রত পাঁজা ভাল স্টপার ছিল। জাতীয় স্কুল দলে খেলেছে। মৃত্যুঞ্জয় হাজরা খুব ভাল স্ট্রাইকার ছিল। বাংলা রাজ্য দলে খেলেছে। জাতীয় দলে স্ট্যান্ডবাই ছিল। অনুপম বিশ্বাস খুবই প্রতিভাবান স্টপার ছিল। দুর্দান্ত স্পটজাম্প এবং ভালো ট্যাকলার ছিল। আমাদের আর এক তারকা পার্থসারথি দে (তমাল)। ইষ্টবেঙ্গল ও টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলে ছিল। রাজ্য দলে খেলেছে এবং জাতীয় দলে স্ট্যান্ডবাই ছিল। টালীগঞ্জ দলের অধিনায়কত্ব করেছে। খুবই ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় ছিল।

শৈলেন মন্ডল ফরোয়ার্ড লাইনে যে খেলা খেলত, তা অনবদ্য ছিল। মহুয়া সংঘের তপন ঘোষ ভাগ্যহীন খেলোয়াড়। জাতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে চোট পায়। তখন ও মুম্বাইতে মহীন্দ্রা মহীন্দ্রা দলে খেলত। পরের মরশুমে এই মিডফিল্ডার কাম স্টপারের মোহনবাগানে খেলার কথা ছিল। এই চোট তার খেলোয়াড় জীবনে দাঁড়ি টেনে দেয়। কার্তিক (সুব্রত) ভট্টাচার্য দুর্দান্ত সাইড ব্যাক ছিল। কমল দত্তও খুব ভাল সাইড ব্যাক ছিল। খড়মপুরের ওয়াজেদ আলি মিডফিল্ডে বা স্ট্রাইকারে সমান দক্ষ ছিল। রাজাপুরের রজব আলি দারুণ স্টপার ছিল। বিধুভূষণ মন্ডল (বিদুর) খুব ভাল লড়িয়ে স্ট্রাইকার ছিল। পোর্ট ট্রাস্টে খেলেছে। সুরজিৎ চক্রবর্তী ইষ্টার্ন রেলে খেলেছে। ভাল স্টপার ছিল। টাউন ক্লাবের বিশ্বজিৎ রায় (বিশু) খুব ভালো স্টপার ছিল। ইষ্টার্ন রেলে খেলত। বাঁশঝাড়ির (শাঁকচূড়া) ময়দান কাঁপানো স্টপার কাম সাইড ব্যাক হাবিবুর রহমান ময়দানের বড় তিন ক্লাবে খেলা ছাড়াও রাজ্য ও জাতীয় দলে খেলেছে।

দীপেন্দু বিশ্বাস
সৌজন্যেঃ দীপেন্দু বিশ্বাস-এর ফেসবুক পেজ

সাম্প্রতিক খেলার সেরা স্টার দীপেন্দু বিশ্বাস (মিঠু)। দুর্দান্ত এই স্ট্রাইকার তিন প্রধানে খেলা

ছাড়াও রাজ্য এবং জাতীয় দলের সম্পদ ছিল। জাতীয় দলের অধিনায়কত্বও করেছে। ২৪৯ গোলের মালিক এখন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক, মহামেডান দলের ফুটবল সচিব এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব। মহামেডান দলের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর। হেডের দক্ষতার জন্য হেড মাস্টার নামে পরিচিত।

ভেবিয়ার দুই স্টার ফুটবলার হল মহেন্দ্র রায় ও গোপাল দে। গোপালদা দারুণ উইংগার ছিলেন। আর মহেন্দ্র খুব ভাল স্টপার ছিল। গোপালদার অনুজ স্বপন দেও বাটা দলের উইংগার ছিল মহেন্দ্র ও গোপালদার মতো। অতি সম্প্রতি প্রীতম সরকার, শানু হাজরা (নিউ বাণী কোচিং সেন্টার) রাজ্য দলে খেলেছে। সমীর বসুর কোচিং সেন্টার থেকে ২/১ জন খেলেছে রাজ্য দলে। তারা অনেক পথ যাবে সেজন্য তাদের আলোচনায় আনলাম না।

মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে সেরা হল টুম্পা মন্ডল। কিশোর বাহিনীর আবিষ্কার টুম্পা রাজ্য স্কুল ও ভারতীয় স্কুল দলে খেলেছে। অকালে চলে যাওয়ায় অনেক কীর্তি সে স্পর্শ করতে পারেনি। সম্প্রতি রাজ্য স্কুল দলে আছে অতসী পাল।

ঋণ স্বীকার ঃ প্রয়াত পিতৃদেব প্রমথভূষণ মজুমদারের ডায়েরীর কিছু অংশ।
তিনি বি. এফ. এ. -র কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন: কিছু ভাবনা

ডঃ অর্চিতা ঘোষ

ভারতীয় অর্থব্যবস্থার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হল ১৯৯১ সাল। ওই বছরে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য - উভয় ক্ষেত্রেই নানাবিধ বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে। তারপর থেকেই ভারতের বাজার সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে তার সুবৃহৎ আয়তন ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে। একথা সত্যি যে, ১৯৯১-এ নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার পর ভারতবর্ষ আর্থিক বৃদ্ধিহার -এ অনেকটাই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে শুরু করে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গড় বৃদ্ধিহার ছিল মাত্র ৩.৫ শতাংশ (যাকে বলা হত 'হিন্দু বৃদ্ধিহার'), যদিও সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে তা বাড়ছিল এবং মধ্য-আশিতে তা বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৫ শতাংশের কাছাকাছি। আর ১৯৯১-এর পর থেকে অর্থাৎ সংস্কার-পরবর্তী সময়ে গড় বৃদ্ধিহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশের উপরে। ২০১৪-এর পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশ এবং ভোগ্যপণ্যের বাজার হিসাবে বিশ্বে তার স্থান ষষ্ঠ। এই বৃহদায়তন বাজারের মাপে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী মূলধন আসছে বহু পরিমাণে, বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার। আর বর্তমানে পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বৃদ্ধিহারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক যোগাযোগ, দেশে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের আয়তন ইত্যাদি দিয়েই মাপা হচ্ছে কোন দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য।

এই পথ অনুসরণ করে মুক্ত অর্থনীতির ভারতে নীতিনির্ধারকরা আরো বেশী করে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন ভারতবর্ষে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কত সহজে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে শ্রম-আইনের সংশোধন, যার অনেক ধারাই শ্রমিক-স্বার্থের পরিপন্থী, কৃষি-আইনে সংশোধনের মধ্যে দিয়ে কৃষির বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে এনে পুঁজিপতিদের প্রবেশ ও কার্যাবলীকে সহজ করে তোলা, এমনকি লাভজনক সরকারী শিল্প সংস্থাতে বিলগ্নীকরণ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই অপ্রতুল। এমনকি চালু কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়াতেও সরকারী অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ প্রদীপের নীচে অন্ধকার যে শুধু জমতে থাকছে তা-ই নয়, তা ক্রমশঃ গাঢ় এবং বিস্তৃত হতে থাকছে।

এই অন্ধকার আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি আর্থিক বৃদ্ধিহারের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসাম্য। আয় এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকছে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের হাতে। ২০১১ সালের একটি হিসাব অনুযায়ী আয় কন্টনের অসাম্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান ছিল ১৫৭ টি দেশের মধ্যে ৯৫ তম। ১৯৯০ সালে যেখানে উপরের ১ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ ছিল, ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২১ শতাংশে। আর নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের উপার্জন মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪.৭ শতাংশ, যেটা ১৯৯১ সালে ছিল ২২.২ শতাংশ। সম্পদের ক্ষেত্রেও একই রকম অসাম্য লক্ষ্য করা যায় আর এই অসাম্য ২০০০ সালের পর থেকে বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। এই চরম আর্থিক অসাম্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ভারতের মানব-উন্নয়ন সূচকে। সম্প্রতি প্রকাশিত মানব-উন্নয়ন রিপোর্টে

দেখা যাচ্ছে মানব-উন্নয়ন সূচকের নিরিখে ২০২০ সালে ভারতের অবস্থান ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ১৩১-তম স্থানে, গত বছরের থেকে যা দু'কদম নীচে। বিশ্বের মোট দরিদ্র জনসাধারণের ২৮ শতাংশই ভারতে বাস করে, যেখানে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ। অত্যন্ত হাস্যকর এক দারিদ্র্যরেখা (আয়ের হিসাবে শহরে মাথাপিছু ৪৭ টাকা ও গ্রামে ৩২ টাকা) অবলম্বন করে দেখানো হচ্ছে যে ভারতে দারিদ্র্য হার কমছে। এটা নীতিনির্ধারকদের এক ধরণের স্বস্তি দিলেও মানব-উন্নয়ন সূচকে এর কুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানব-উন্নয়ন সূচক তৈরি হয় দেশের মাথাপিছু আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর ভিত্তি করে। সরকারী হিসাবে ভারতের ৯৩ শতাংশের উপর মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকলেও প্রকৃত অবস্থায় অতি অল্প আয়, বা এমনকি কর্মহীনতার কারণে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ জীবন নির্বাহের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় রসদও সংগ্রহে অপারগ। স্বাধীনতার সাত দশক পরেও এদেশের মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে অসমর্থ। সম্প্রতি প্রকাশিত ক্ষুধা-সূচক ভারতের আর্থিক উন্নয়নকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতে বিগত কয়েক বছর ধরে ক্ষুধার যে চিত্র প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তা অতি ভয়ংকর। ক্ষুধা-সূচকে ভারতের স্থান সংস্কার-পরবর্তী সময়ে ক্রমশঃ নিম্নগামী। ১৯৯২ সালে ৯৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ৭৬, ২০০০ সালে তা দাঁড়ায় ১১৩টি দেশের মধ্যে ৮৩ এবং ২০২০ সালে ১০৭ টি দেশের মধ্যে ৯৪।

ক্ষুধা-সূচকের একটি উপাদান হল অপুষ্টি। সাম্প্রতিকতম হিসাব বলছে ভারতের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশই সামগ্রিকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। ক্ষুধা-সূচকে অন্য দুটি উপাদান নির্ভর করে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান পাওয়ার উপর। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শারীরিক বৃদ্ধির অভাব এক্ষেত্রে দুভাবে মাপা হয়- শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন (Child wasting) এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতার (Child stunting) হিসাব দিয়ে। ভারতে শিশুদের ১৭.৩ শতাংশেরই উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম, আর এ ব্যাপারে ভারত বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে নীচে অবস্থান করছে। ৩৭.৪ শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়স অনুযায়ী কম। এই দুটি তথ্য থেকেই একথা পরিষ্কার যে ভারত উচ্চ বৃদ্ধিহারের দেশ হলেও সেই আর্থিক বৃদ্ধি দেশের একটা বড় অংশের শিশুর পুষ্টি যোগাতে অক্ষম। ক্ষুধা-সূচকের অন্য উপাদান শিশুমৃত্যুর হার ভারতবর্ষে ক্রমহ্রাসমান হলেও জীবিত শিশুরা একটি উপযুক্ত জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অপুষ্টির এই চিত্রটি ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৯-২০ সালে খারাপ হয়েছে। এটাও দেখা গেছে যে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে উপরে থাকা অনেক রাজ্যেও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি ক্রমবর্ধমান।

আবার, বর্তমানে কর্মক্ষম ভারতীয়, অর্থাৎ ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক ভারতীয় নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রক্তাল্পতা ও স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরও একটা বড় কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষম নাগরিক বা শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ সঠিক পুষ্টির অভাবে ভুগছে। বর্তমান ভারতে অনেকরকম সরকারী সাহায্যের কারণে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর ঘটনা কমে আসলেও অভাব রয়ে যাচ্ছে পুষ্টির যোগানের। প্রয়োজনের তুলনায় আয় কম হওয়ায় কোনভাবে ক্ষুধানিবৃত্তি হলেও মানুষ সুষম খাদ্য যোগাড় করতে পারছে না। এই বিপুল সংখ্যক জনতাকে যদি মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে হয়, তবে জীবনধারণের ভিত্তিসূচক সুষম খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করে তোলা প্রয়োজন। আর এই নিশ্চিত করে তোলার কাজটা সরকারকেই করতে হবে। একথা মনে রাখা দরকার উন্নয়নের চুঁইয়ে পড়া (Trickle down)-র তত্ত্ব আজ আর কার্যকর হয় না। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ও ব্যবহার, তার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য ইত্যাদি পিছিয়ে থাকা মানুষের অগ্রগমনের পথে প্রায়শঃই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তার ফলে অসাম্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষায় বেসরকারী প্রাধান্য বেড়ে চলায় এবং সরকারী বিনিয়োগ না বাড়ায় আগামী দিনে হয়তো এই অসাম্য আরো ভয়ানক রূপ নেবে। সামগ্রিক ভাবে দেশের পক্ষে তা হিতকর নয়। বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার যদি তার সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে ভুলে যায় বা কল্যাণকর কার্যাবলীকে কমিয়ে আনে, দীর্ঘ মেয়াদে তা দেশকেই পিছিয়ে দেবে।

বেসরকারীকরণ - কার স্বার্থে?

শ্রী মুরারি চক্রবর্ত্তী

আজকাল আমরা আমাদের বেশ কিছু দেশনেতা এবং তাদের বশংবদ কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে Decentralisation, Privatisation, Asset Monetisation এইসব শব্দ এবং এগুলোর কার্যকারিতা বা উপকারিতা এবং দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন কতটা তার ব্যাখ্যা প্রায়শই শুনতে পাই। মোদ্দা কথা হল সরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী Asset বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেচে দিলে প্রভূত সমস্যার সমাধান হবে। এমন এই ''হরির লুটের'' বাস্তব চিত্রটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

প্রথমেই যেসব মুক্ত অর্থনীতির দেশগুলোর উদাহরণ আমাদের ভারতীয় বেসরকারীকরণের সমর্থনকারীরা দিয়ে থাকেন সেইসব দেশের চিত্রটা একটু দেখি। দুই বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা। আমেরিকায় প্রভূত সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার পরিচালিত ক্ষেত্র বিদ্যমান। USA-র কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ Amtrak, Anacostia Waterfront Corporation, Commodity Credit Corporation, Conrail, Export-Import Bank of the United States, Farm Credit System Corporation, Federal Crop Insurance Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Retirement Thrift Investment Board, Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Legal Services Corporation, NeighborWorks America, North Dakota Mill and Elevator, Pension Benefit Guaranty Corporation, Public Development Authority, Resolution Trust Corporation, Virgin Island Company, Waterfront Development Corporation এবং আরও অনেক ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান। ইংল্যান্ড বা UK তে মার্গারেট থ্যাচার এর আমলে সব থেকে বেসরকারীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রেই সরকার পরিচালিত বা সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান দক্ষ ভাবেই চলছে। কিছু উদাহরণ- British Business Bank, CDC Group, Companies House, Direct Rail Service, Directly Operated Railways, Green Investment Group, Landmark Mortgages, London and Continental Railways, London North Eastern Railway, National Savings and Investment, NATS Holdings, NatWest Group, Post Office Money, Student Loans Company, Urenco Group, UK Financial Investments, Wave Hub, working Links, East West Rail, Home England, Highways England, South Eastern Trains, East Coast. সব থেকে মজার কথা হল আমাদের দেশে যখন বেসরকারীকরণের যুক্তির ঢেউ চলছে তখন দেখি, ব্রিটেনে অদক্ষ পরিচালনার জন্য- Rail Track কে renationalise করে সরকার পরিচালিত Network rail এর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাকে কী বলবেন ভারতীয় বোদ্ধারা?

বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশেও সরকার পরিচালিত ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান বহালতবিয়তে দক্ষতার সাথেই চলছে। প্রশ্ন হল তারা কি ভারতীয়দের থেকে কম বুদ্ধিমান বা কম বোঝেন? আসলে ওই দেশগুলোতে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের অহেতুক হস্তক্ষেপ নেই। সরকারী ক্ষেত্র বা Public Sector বলতে সরকারী মালিকানাধীন ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানকেই বুঝি। ভারতে Public Sector undertaking বলতে বুঝি সেই সব

ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানকে যেখানে সরকারের Share বা মালিকানা ৫১ শতাংশ বা তার বেশী। Railways Atomic Energy এবং Explosive Materials সরকারী ক্ষেত্র হিসাবে সংরক্ষিত। (যদিও বর্তমানে Railways এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ঘটছে।)

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বছরগুলোতে Public Sector এর দ্রুত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য-দূরীকরণ, বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন, আঞ্চলিক-বৈষম্যদূরীকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। মার্চ ২০১১-তে সরকারী ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৫০ লক্ষ। ভিলাই, রৌরকেল্লার মত পিছিয়ে পড়া বা Backward অঞ্চলকে শিল্পনগরী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১০-১১ তে ২২০ টি CPSE এর মধ্যে ১৫৮টি ছিল লাভজনক এবং ৬২টি ছিল অলাভজনক। ১৫৮ টি লাভজনক (Profit making) CPSE -র লাভ বা Profit এর পরিমাণ ছিল ১,১৩,৭৭০ কোটি টাকা এবং ৬২টি অলাভজনক (Loss making) CPSE -র ক্ষতি বা Loss এর পরিমাণ ছিল- ২১, ৬৯৩ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ তে বিশ্বব্যাপী Crude Oil এর বিপুল মূল্যবৃদ্ধির সময়ে ভারতীয় OMC (Public Sector Oil Making Companies) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রেখে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।

এখন আমাদের দেশে এই বেসরকারীকরণের প্রেক্ষিতটা দেখা যাক। ১৯৯১-৯২ সালে আমাদের Budgetary Expenditure ছিল ১,১৩,৪২২ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১,৪৬,৭৩৪ কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি এবং তার ফলে Fiscal deficit কে minimise করার জন্য সরকার ধীরে ধীরে divest করতে শুরু করে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে BALCO, Hindustan Zinc, Indian Petrochemicals Corporation এবং VSNL(Videsh Sandar Nigam Ltd) এর সরকারী শেয়ার বিক্রি করা হয়। BALCO এবং Hindustan Zinc এর শেয়ার বিক্রি করা হয় Sterlite Industries এর কাছে, VSNL এর শেয়ার বিক্রি করা হয় Tata Group এর কাছে এবং Indian Petrochemicals Corporation এর শেয়ার বিক্রী করা হয় Reliance Industries এর কাছে। উল্লেখ্য, এই সবগুলোই ছিল লাভজনক সংস্থা। স্বাভাবিকভাবেই, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লোলুপ দৃষ্টি তো লাভজনক সংস্থার দিকেই থাকবে। ২০১৪ থেকে ২০১৮-র মধ্যে ভারত সরকারের divest-এর পরিমাণ ১,৯৪,৬৪৬ কোটি টাকা। ১৯৯১-১৯৯২ থেকে ২০১৭-১৮ অবধি divest এর পরিমাণ ৩,৪৭,৪৩৯ কোটি টাকা।

এখন প্রশ্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মানেই দক্ষ? তাই যদি হয় তাহলে বহু বড়ো বড়ো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান লাটে উঠল কী করে ? ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি তো ছেড়ে দিলাম- কিংফিশার এয়ার লাইনস্, জেট্ এয়ার ওয়েজ, এসার স্টীল, ভূষণ স্টীল, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন্, গীতাঞ্জলি জেমস্, REI Agro, ABG Shipyard Ltd, Gili India Ltd, Ruchi Soya Industries, Winsome Diamonds and Jwellery Ltd - আরও বহু নামজাদা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠানই সরকারী ব্যাঙ্কগুলির টাকা পরিশোধ না করে সেগুলোকে পথে বসাবার ব্যবস্থা করেছে। তবু আমরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে সাফাই গাইবো। কারণ আমরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সরকারী শেয়ার বিক্রির সময়ও কি কিছু নিয়ম লঙ্ঘন দেখা যায়নি ? Auditor General of India-র observation অনুযায়ী- divest -এর সময় BALCO-র core and non-core assets- not properly identified and properly valued and mines of Hindustan Zinc Ltd were either discounted or not considered. বুঝুন ব্যাপার! সর্ষের মধ্যেই ভূত।

এবার লোলুপ দৃষ্টি - সরকারী ব্যাংকের উপর। যুক্তি - সরকারী ব্যাংককে আরও দক্ষ পরিচালনার জন্য বেসরকারীকরণ করতে হবে। বাস্তব চিত্রটা দেখা যাক। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সাল অবধি ৫৫৯টি বেসরকারী ব্যাংক বহু ভারতীয়কে সর্বস্বান্ত করে উঠে গেছে। ১৯৬৯ সালে ব্যাংক জাতীয়করণের পরে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এসেছে। ব্যাংক বেসরকারীকরণের পক্ষে যাঁরা, তাঁদের যুক্তি, ওসব অতীতের কথা। বর্তমানে প্রাইভেট ব্যাংক অনেক দক্ষ, অনেক ভালো কথা। প্রশ্ন - তাহলে ১৯৬৯ সালের পরে ৩৬ টা বেসরকারী ব্যাংকের সাইনবোর্ড উঠে গেল কেন? ঢাক ঢোল বাজিয়ে High Profile- বেসরকারী ব্যাংক Global Trust Bank লাটে উঠল কী করে? এবং আমানতকারীদের স্বার্থ-রক্ষার্থে ২০০৪ সালে সরকারী Oriental Bank of Commerce, Global Trust Bank কে অধিগ্রহণ করতে হল কেন?

১৯৯০ সালের পর ডিগবাজি খাওয়া কিছু প্রাইভেট ব্যাংকের উদাহরণ-
১৯৯০- Bank of Travancore, ১৯৯১- Parur Central Bank, ১৯৯১- Purbanchal Bank, ১৯৯৩- Bank of Karad Ltd, ১৯৯৫- Kashi nath Seth Bank, ১৯৯৯-20th Century Financial Corporation, ১৯৯৯- Sikkim Bank Ltd, ২০০০- Times Bank Ltd

আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার্থে সরকারী ব্যাংকদেরকেই এই সব Failed- Private Banks অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। প্রশ্ন Private Bank যদি Public Sector Bank এর থেকে দক্ষ ও কুশলী হয়, তাহলে এরা Fail করল কী ভাবে? আর এই Failed- Private Banks এর বিষ নীলকণ্ঠ মহাদেব হয়ে সরকারী ব্যাংকগুলোকে পান করতে হল কেন?

শুধু আমাদের দেশে নয়, আমেরিকাতেও ২০০০-এর পর বহু বেসরকারী ব্যাংক উঠে গেছে। বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার লাটে ওঠা বেসরকারী ব্যাংক এর খবর আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রাখেন কি? না কি জেনেও জানব না প্রতিজ্ঞা করে আছেন। ভারতীয় সরকারী ব্যাংকগুলো অনাদায়ী ঋণের চাপে (NPA) রুগ্ন হয়ে পড়ছে। এই অনাদায়ী ঋণের কতটা পরিমাণ বড় বড় শিল্পপতিদের কাছ থেকে পাওনা ? বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সীদের মত বড় বড় শিল্পপতি, কেষ্টবিষ্টুরা সরকারী ব্যাংকের টাকা মেরে সরকারী ব্যাংকগুলোকে রুগ্ন করেছে। আর বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক সরকারী ব্যাংক বেসরকারীকরণের পক্ষে বুলি আওড়াচ্ছে। NCLT তে ১২টি Insolvency and Bankruptcy Case এর পরিমাণ ২,৫৩,০০০ কোটি টাকা এবং এরা সবাই বেসরকারী করপোরেট। মজার কথা সমীক্ষা করে দেখা গেছে- ভারতের বড় বড় বেসরকারী বিজনেস হাউস ও ব্যাংকিং লেনদেন এর ক্ষেত্রে Private Bank এ আস্থা নেই। RBI এর প্রাক্তন Deputy Governor বিরল আচার্য্য, যিনি ব্যাংক বেসরকারীকরণের পক্ষে সওয়াল করেছেন, তিনিও স্বীকার করেছেন Private Corporate House রা আমানত বা deposite করার সময় Private Bank এর থেকে SBI ও অন্যান্য সরকারী ব্যাংকগুলোকেই বেছে নেয়।

তাহলে সরকারী প্রতিষ্ঠান না বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি ভালো, কোনটি দক্ষ- এই ব্যাপারে UNDP বিভিন্ন দেশে সার্ভে করে মন্তব্য করেছে, "The efficiency is largely dependent on the country context, the sector and in many cases, the specific firms that are operating in the market. This review finds no conclusive evidence that one model of ownership (i.e, public private or mixed) is intrinsically more efficient than the others." ভারতীয় বোদ্ধারা এটা মানবেন কি? নাকি ডালমে.....?

SIGNIFICANCE OF GST

Shri Gaurab Das

JOURNEY OF GST

Goods and Services Tax (GST) is a paradigm shift in the area of indirect tax in India. The journey began in the year 2000 when a committee was set up to draft law by the then Central Government lead by PM Late Atal Behari Vajpayee. Our very own Dr. Asim Dasgupta was the first chairman of that committee. It took 17 years from then for the Law to evolve. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. Finally, the Act came into effect on 1st July 2017.

WHAT IS GST?

In simple words GST is an indirect tax levied on the supply of goods and services. This law has replaced many indirect tax laws that previously existed in India. Goods & Services Tax Law in India is a **comprehensive**, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. GST is **one indirect tax** for the **entire country**. "One nation one tax", is the main motto. Earlier there are so many indirect taxes levied on different level of transaction both by the Central and State Government. Many of these laws subsumed into GST. The following taxes are being subsumed:

At Central level -

1. Central Excise Duty,
2. Additional Excise Duty,
3. Service Tax,
4. Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and
5. Special Additional Duty of Customs.

At State level –

1. State Value Added Tax/Sales Tax,
2. Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States),
3. Octroi and Entry tax,

4. Purchase Tax,
5. Luxury tax, and
6. Taxes on lottery, betting and gambling.

Many people may have the misconception that all the above laws have been abolished; that is not the case. All the laws are still there only subsumed into GST.

LAWS BEFORE GST

GST is expected to facilitate the operation of lower end of the business spectrum, including the process of starting a business as well as for small and medium business to run without facing too much of complexity. With the distinction between the services and goods gone, it was expected to make compliance easier. In the earlier indirect tax regime, there were many indirect taxes levied by both state and centre. Central collects excise duty on manufacturing and service tax on every service provided subject to some exceptions. States mainly collected taxes in the form of Value Added Tax (VAT) on sale. Every state had a different set of rules and regulations. So it was very difficult to comply.

Interstate sale of goods was taxed by the Centre. CST (Central State Tax) was applicable in case of interstate sale of goods. Other than above there were many indirect taxes like entertainment tax, octroi and local tax that was levied by state and centre.

This led to a lot of overlapping of taxes levied by both state and centre. For example, when goods were manufactured and sold, excise duty was charged by the centre. Over and above Excise Duty, VAT was also charged by the State. This lead to a tax on tax also known as the cascading effect of taxes.

One of the major changes in GST era is that now it is destination based that is the state where it consumed. Consider goods manufactured in Maharashtra and are sold to the final consumer in West Bengal. Since Goods & Service Tax is levied at the point of consumption. So, the entire tax revenue will go to West Bengal and not to Maharashtra. Earlier the same tax revenue gone to Maharashtra. A populous state like, West Bengal, should

be immensely beneficial during the GST regime because of its potential for more consumption.

MAIN COMPONENTS OF GST:

There are mainly three taxes applicable under this system:

- CGST: Collected by the Central Government on an intra-state sale (Eg: transaction happening within West Bengal). Revenue will be shared equally between the Centre and the State.
- SGST: Collected by the State Government on an intra-state sale (Eg: transaction happening within West Bengal). Revenue will be shared equally between the Centre and the State.
- IGST: Collected by the Central Government for inter-state sale (Eg: West Bengal to other state). There will only be one type of tax (central) in case of inter-state sales. The Centre will then share the IGST revenue based on the destination of goods.

ADVANTAGES OF GST:

GST has mainly removed the 'cascading effect' on the sale of goods and services, that is expected to reflect on the cost of goods. Since the GST regime eliminates the tax on tax, the cost of goods decreases.

GST is also technologically driven. All activities like, registration, return-filing, application for refund and response to notice, are to be done online on the GST Portal thereby accelerating the processes. Also due to minimal human interaction issue of corruption could be checked.

Earlier there were sale, manufacturing, services etc. Each of these components was dealt by different laws. Sale dealt by State VAT and CST, manufacturing was dealt by the Central Excise, services by Service tax law so on and so forth. Now there are no such components except Supply. Supply consists everything sale, transfer, exchange, barter, license, service etc. For every supply dealer have to pay GST on value addition except Alcohol for human consumption (i.e., not for commercial use); Petrol and petroleum products (GST will apply at a later date), i.e., petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit (petrol), natural gas, aviation turbine fuel.

DISADVANTAGES OF GST

The main criticism of GST is its complexity; as various flaws have been observed in it in comparison with the systems prevalent in other countries. Most significantly, it has numerous tax-rates and the highest rate is 28 percent. GST's implementation in India has been further criticized by Indian businessmen for problems including delays in tax refund, too much of documentation and frequent technical faults in the GSTIN site.

CONCLUSION

GST is a new law and still in the process of evolvement as evident from large number of meetings of the GST Council and frequent amendments made in the Act, Rules and rates. There are certain difficulties in the law which the GST Council tries to mitigate from time to time. Nevertheless, this is one of the major changes in the taxing matter in the independent India.

Spell-Bee Competition 2019

ইছামতীর বুকে:
নদী উৎসব, নদী পর্যটন

শ্রী অরুণাভ দাস

আমার এখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়
ঝিলিমিলি ইছামতীর বুকে
ভোরবেলার ভ্রমণসঙ্গী
ঘুমভাঙানি লাল সূর্যর কথাকলি নাচ
মুক্ত প্রকৃতি মুক্ত পৃথিবীর রামধনুছটা
অনন্য পুলক জাগায়
হৃদয়ের তেপান্তরে
বিশ্রাম আর প্রশান্তির প্রহর সাজাই
ইছামতীর বালুচরে
রোদজ্বালে রোজ চড়ুইভাতি
যোগান দেয় খুশির উদযাপন
গুলতি দিয়ে কুঁজবক বালিহাঁস শিকার
আনন্দের উড়ান দিব্যি ছেড়ে দেয়
লাটাই-এর সুতো, আকাশ জুড়ে
অগুনতি ঘুড়ির ভোকাট্টা
সন্ধেবেলা খেঁজুরবাগানে
জিরেন রসের মাধুকরী
নিমেষে উবে যায় দেহমনের ক্লান্তি
মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার আলোছায়া
আমাকে শৈশবের ঘুম পাড়ায়
ছলাত ছলাত ইছামতীর ঢেউদোলা
মায়াবী স্রোতবহা; স্বপ্নের পাল তুলে
ডিঙি নৌকায় রাতভর ভেসে চলা
নিসর্গ নক্ষত্র নীহারিকার টানে
অনন্ত ছায়াপথ পরিক্রমা
সঙ্গী বলতে শুধুই ইছামতী....

ইছামতীর পাড়েই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। ইছামতীর দুপার জুড়ে আমাদের চার পুরুষের যাপন। তাই ইছামতীকে নিয়ে আজও স্বপ্ন দেখি, কবিতা লিখি। কবিতার সবকটি লাইনই ঘটিত সত্য। ছোটোবেলার সঙ্গী, স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে ১২ ক্লাস পর্যন্ত ইছামতীর বুকে প্রশান্ত বিনোদন, আনন্দঘন জীবনের কিছু মুহূর্ত (১৯৮৩ পর্যন্ত)।

নদী মানে সভ্যতা, নদী মানে সংস্কৃতি, নদী মানে জীবন। সারা ভারতে, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নদীকে কেন্দ্র করে কত উৎসব, কত মেলা, কত পর্যটন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজও বিভিন্ন ছোট বড় শহরে গঞ্জে গ্রামে নতুন নতুন নদী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। নদীর দুই পাড়ে অগণিত মানুষের মহামিলন; সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক পর্যটনের বিচিত্র সমারোহ; বহু মানুষের জীবন যাপনের বড় সুরাহা।

পৌরাণিক এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বহুদিন থেকেই প্রচলিত পুষ্করম উৎসব। বিশেষত, ভারতের প্রধান বারোটি নদীকে কেন্দ্র করে। এক একটি নদীর পাড়ে, ১২ বছর অন্তর একবার করে এই উৎসব আয়োজিত হয়। তিথি-নক্ষত্র-রাশির অবস্থান অনুযায়ী, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, তাপ্তি, সরস্বতী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা, ভীমা, প্রাণহিতা ও সিন্ধু নদীর ধারে বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই উৎসবের আয়োজন হয়। মূল উদ্দেশ্য - নদীর গুরুত্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা, মানবজীবনে নদীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা, নদীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূজার ডালি নিবেদন করা। এক কথায়, নদীকে নতুন জীবন দান করা এবং পবিত্র করে তোলার শপথ নেওয়া। পুষ্করম উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু ভ্রমণার্থীর ঢল, ধার্মিক মানুষের সমাগম, সাংস্কৃতিক উৎসব, হস্তশিল্পের মেলা -- সব মিলিয়ে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ। এছাড়া বছরের এক একটা নির্দিষ্ট দিনে প্রায় সব নদীর বুকে কোন না কোন পুজো পার্বণ অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। যেমন মকর-সংক্রান্তির স্নান, টুসু পুজো, বারুণী পুজো, মহালয়ার তর্পণ, বিভিন্ন পুজোর পর প্রতিমা

নিরঞ্জন ইত্যাদি। অধুনা পরিবেশ সচেতনতার জন্য এবং মূলত নদী দূষণ বন্ধ করার জন্য ভারতের বিভিন্ন নদী-শহরে বছরে অন্তত একবার নদী উৎসবের প্রচলন শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বিখ্যাত-- ছোট বড় বিভিন্ন শহরে গঙ্গা দশহরা উৎসব, লাদাখে সিন্ধু দর্শন উৎসব, আসামের গৌহাটি সহ বিভিন্ন জেলায় নমামি ব্রহ্মপুত্র নদী উৎসব।

এবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে, দৈনন্দিন উদযাপিত নদী পর্যটনের কথায় আসি। প্রথমেই মনে পড়ে, পানাজিতে মাণ্ডভী নদীকে কেন্দ্র করে এক রঙিন মহোৎসব। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ছোট বড় লঞ্চ-স্টিমারে নদী বুকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভেসে চলা। উচ্ছল জলরাশি, বুকে সূর্যাস্তের হোলি খেলা, আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিনোদন আর দুপারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ। সঙ্গে সান্ধ্য জলখাবার এবং নৈশ আহার। গৌহাটি শহরে ব্রহ্মপুত্র রিভার ক্রুজ এবং হায়দ্রাবাদের হোসেন সাগরে স্টিমার ক্রুজ সত্যিই মনোরম এবং উপভোগ্য। একসময় কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পারে সন্ধের পর ভুতুড়ে আঁধার নামত। বেশ কিছু বছর হল, দক্ষিণে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে উত্তরে মিলেনিয়াম পার্ক পর্যন্ত অপূর্ব সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গঙ্গার পাড়ে বসে বিকেল-সন্ধে উপভোগ করছে। আছে ছোট-বড় স্টিমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের ব্যবস্থা, বাবুঘাটে হাল-টানা ডিঙি নৌকায় বসে গঙ্গার হাওয়া খাওয়ার সুব্যবস্থা। লঞ্চ বা স্টিমার মিলেনিয়াম পার্ক থেকে দক্ষিণে বজবজ এবং উত্তরে বেলুড় মঠ পর্যন্ত দুই প্রান্তে প্রদক্ষিণ করায়। বড় স্টিমার বুক করে ক্লাব-অফিসের পিকনিক, মিটিং, পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজিত হচ্ছে।

ছোট্ট প্রবাস জীবনে দেখেছি, লন্ডনের টেমস নদীর বুকে এবং নদীর দুই ধারে কি অপূর্ব পর্যটন বিনোদনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা। একটা নদী তার তীরস্থ শহরকে কত সুন্দর বাঁচিয়ে রাখতে পারে, প্রাণবন্ত

উৎসবমুখর রাখতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত--আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় -- লন্ডন এবং পানাজি। তীর্থ এবং প্রকৃতি যাপনের পীঠস্থান--গঙ্গাতীরের হরিদ্বার ও বারাণসীর কথা সকলেই জানেন।

ধান ভাঙতে শিবের গাজন। অনেকেই দীর্ঘ লেখা পড়তে বিরক্ত হচ্ছেন। একটু কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। লেখাটার আসল উদ্দেশ্য-- অতি গর্বের, ভালোবাসার নদী, ইছামতী এবং তার দুই তীরে অবস্থিত বসিরহাটের গ্রাম-শহরে কিভাবে প্রকৃতি পর্যটনের চারা রোপণ করা যায়, তাই নিয়ে কিছু স্বপ্ন, কল্পনা, চিন্তাভাবনা; কিছু ইচ্ছেডানা মেলে ধরার বাসনা ..... তেঁতুলিয়া থেকে টাকী, মূলত, উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখী আমাদের ইছামতী, চলে আঁকেবাঁকে। মাঝে বসিরহাট শহরের পাশে কিছুটা পশ্চিম থেকে পূর্ব মুখী, শ্মশানঘাট থেকে ইটিন্ডাঘাট। গোকুলপুর, মেদিয়া, ফতুল্লপুর, বাজিতপুর, বিরামনগর, সংগ্রামপুর, মেরুদন্ডি, আখারপুর, পানিতর -- এই পারে গ্রাম্য সবুজের মাঝে প্রকৃতির অতুলনীয় সম্পদ। অন্য পারে বাদুড়িয়া, তারাগুনিয়া, হরিশপুর, বসিরহাট, শহুরে সুযোগ-সুবিধায় যথেষ্ট ভরপুর। মাঝখানে ইছামতী সেতুর কল্যাণে গ্রাম-শহরের অপূর্ব মেলবন্ধন।

বসিরহাট শহরের পাড়ে অত্যধিক জনবসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-কাছারি এবং স্কুল-কলেজের কারণে নতুন করে পর্যটক আবাস বা স্বপ্নের সবুজ গ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই ইছামতীর অপর পাড়ে গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতি-প্রেমীদের জন্য সুন্দর ইকো-ভিলেজ গড়ে তোলা যায়। জানি, ইছামতীর পাড়ে রাজ করছে অসংখ্য ইটভাটা, মাছের ভেড়ি, হাইব্রিড মাগুর চাষের জলাশয়। তাই সম্ভব হলে নদীর পাড়ে অথবা দুই-তিনশ মিটার দূরে গ্রামের মধ্যে, পাঁচ-সাত বিঘে জমির ওপর গড়ে উঠুক পরিবেশবান্ধব সবুজ শান্তিগ্রাম ; দুই-তিন কিলোমিটার দূরে দূরে।

দু-তিনদিন ইছামতীর পাড়ে শান্তির বিশ্রাম, গ্রাম্য জীবন-সংস্কৃতির স্বাদ-গ্রহণ এক অনন্য অনুভূতি। বিকেল-সন্ধে কিংবা চাঁদনী রাতে ইছামতীর বুকে ডিঙি নৌকায় ভেসে বেড়ানো সারা জীবন মনে থাকবে। অতি উৎসাহী ভ্রমণার্থীরা আন্তজার্তিক সীমান্ত গ্রাম -- ভারতের ঘোজাডাঙ্গা এবং বাংলাদেশের ভোমরা পরিদর্শন করতে পারেন।

বাদুড়িয়া থেকে ইটিন্ডাঘাট, ইছামতীর বুকে ছোট ছোট স্টিমারে কিংবা যান্ত্রিক নৌকায় বিনোদনের আয়োজন করলে পর্যটকের ঢল নামবে। দুপারের বিভিন্ন পয়েন্টে ওঠানামার ব্যবস্থা থাকবে। রোমাঞ্চ-প্রিয় ভ্রমনার্থীরা টাকী, হিঙ্গলগঞ্জ, সুদুর-দক্ষিণে হেমনগর ছুঁয়ে সুন্দরবন ঘুরে আসতে পারেন।

ইছামতী নদী উৎসবের কথায় প্রথমেই মনে পড়ে বছরের একটি দিন। বাঙালির জাতীয় উৎসব -- দুর্গাপুজোর পর বিজয়াদশমী। ইছামতীর দুপারে অগণিত দর্শক। নদীবক্ষে শতশত ঠাকুরের নৌকা, দর্শনার্থীর নৌকা। সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায় বিষন্নতা, সাতপাক ঘুরিয়ে নদীবক্ষে দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জন। 'বলো দুর্গা মাইকি জয়; আসছে বছর আবার হবে'-- ধ্বনিতে ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। দল বেঁধে ঘরে ফেরা। কোলাকুলি, প্রণাম আর মিষ্টি মুখে বিজয়ার ধুমধাম ইছামতীর দুপাড়ে; শহরে, গ্রামে, ঘরে ঘরে।

অন্য ধারার নদী উৎসবও ভাবা যায়। ইছামতীকে ভালবেসে, তার শ্রীবৃদ্ধি রক্ষায়, দূষণ প্রতিরোধে, সচেতনতার প্রচার নিয়ে দুই-তিন দিন ব্যাপী নদী উৎসব পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে কিংবা হেমন্তের রাস পূর্ণিমায় বা বসন্তের দোল পূর্ণিমায় এই উৎসব হলে অনেক জনসমাগম হবে।

ইছামতীর দুপারে বসবাসকারী আপামর জনগণ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপ্রিয় মানুষজনের কাছে একান্ত নিবেদন -- আপনারা ইছামতীকে কেন্দ্রবিন্দু করে পর্যটনের বিকাশ কিভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করুন। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং জেলাস্তরে প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্যমে ইছামতী নদী উৎসব, নদী পর্যটন বাস্তবায়িত হলে আমাদের জন্মভূমি বসিরহাটের নাম বাংলার ভ্রমণ মানচিত্রে একটা উজ্জ্বল জায়গা করে নেবে।

সমাজের 'না-পন্থী' কিছু মানুষ এই লেখাটি পড়ে হয়তো দিবাস্বপ্ন বা পাগলের প্রলাপ ভেবে উপহাসে মত্ত হবেন। তাদেরকে টাকীর কথা মনে করাতে চাই। আজ থেকে ১৫ বছর আগে কেউ ভাবতে পারেনি যে টাকী একটা দুতিনদিনের পর্যটন ক্ষেত্র হতে পারে। টাকীতে সেই একই ইছামতী, ওপারে বাংলাদেশ এবং দুর্গা প্রতিমার ভাসান। সুতরাং বসিরহাটেও অবশ্যই সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং বিকল্প ভাবনার অনুসারী হয়ে বসিরহাটবাসী যথাযথ উদ্যোগ নিলে ইছামতীর বুকে নদী-উৎসব, নদী পর্যটনের জোয়ার-ভাটা খেলতেই পারে।

ছবি সৌজন্যেঃ লেখক

শৈশবের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি

শ্রীমতী মুনমুন দাস

শরতের স্নিগ্ধ নীল আকাশ। গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘেদের ভেসে বেড়ানো নীল আকাশ জুড়ে। হালকা শীত শীত ভাব। চারিদিকে কুয়াশার পাতলা আবরণ। শিউলি গাছের তলায় তারার মতো অজস্র ফুলের সমারোহ। দূরে কাসর ধ্বনি, ঢাকের শব্দ। মা আসছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। পুজো আসছে। আর এদিকে আমাদের নতুন জামা বানানোর ধুম লেগে গেছে। কবে সময় করে বাবা নিয়ে যাবেন গজ কাপড়ের দোকানে। অনেকেই আগে ভাগে বানিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, পুজোর আগে দেখাবে না। এদিকে আমার তর সইছে না। বাবার স্কুল ছুটি থাকে রবিবার। প্রতি রবিবার অপেক্ষা করে থাকি। মাঝখানে আর মাত্র ২/৩টি রবিবার বাকি। বাবা নিয়ে যান না। খুব মন খারাপ করে পুরো রবিবার অপেক্ষা করে রাতে চোখ ছলছল করে ঘুমোতে যাই। এক রবিবারে বাবা, মা, দিদি, আমাকে নিয়ে হাজির পুজোর জামা কিনবেন বলে। তখন শপিং, মার্কেটিং কথাগুলো আমরা জানতাম না। রেডিমেড জামাও কম কেনা হত। গজ কাপড় কিনে দর্জিকে দিয়ে জামা বানানো হত। স্কুলে যাওয়ার পথে ছিল দর্জির দোকান। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখে আসতাম জামাটা কেটেছে কিনা। সে কী ছটফটানি। প্রতিবারই গিয়ে দেখতাম সেই যে বেঁধে কাপড় সাজিয়ে রেখেছে তাকের উপর ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে।

চার পাঁচদিন হয়ে গেল পুজো দরজার কড়া নাড়ছে। আমি মন খারাপ নিয়ে ঘরে আসি। আসার সময় বলে আসি সঞ্জয়কাকু, আজ অবশ্যই জামাটা কাটবেন। পরের দিন গিয়ে দেখি আমার জামাটা কাটছে সেলাইয়ের জন্য। আমার খুশি আর ধরে না। কাটা কাপড়গুলি কুড়িয়ে বাড়ি চলে আসলাম। এসেই আমার পুতুলের জন্য জামা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তখন একটা বা দুটো নতুন জামা পেতাম পুজোর সময়ে, তাতেই মহাখুশি। আর অবশ্যই চাই বাটার দোকানের জুতো আর উপহার স্বরূপ দোকানের পক্ষ থেকে একটা বড় বেলুন। যথারীতি পুজোর দিন চলে আসত। সপ্তমীর দিন হয়তো গত বছরের পুজোর পুরানো জামা পরেই ঠাকুর দেখা হতো। মহা অষ্টমীর দিন খুব ভোরে উঠে স্নান করে উপোস রেখে নতুন জামা পরে ভোঁ দৌড় বাড়ির পাশের পুজো মন্ডপে অঞ্জলি দেবার জন্য। পুরোহিত মহাশয় কী মন্ত্র পড়তেন কিছুই বুঝতাম না। শুধু মুখ নাড়তাম সবাইয়ের সাথে। মন্ত্র বুঝি আর না বুঝি ফুল বেলপাতা দুহাত ভরে আগে ভাগে নেওয়া চাই। অঞ্জলি শেষে কপালে বড়ো করে যজ্ঞের এক কালো ফোঁটা দিয়ে সব পুণ্যি অর্জন করে ঘরে ফিরতাম এক ঝুড়ি খুশি নিয়ে। ঘরে এসে ফুলকো লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম। সে সব খাবারের কথা মনে পড়লেই আজও জিভে জল চলে আসে। নবমীর দিন হতো খাসির মাংস। মামাবাড়ির সবাই আসত আমাদের বাড়িতে। হৈ-হুল্লোড়ে নবমীর দিন কেটে যেত। এভাবে পুজোর দিনগুলি খুব দ্রুত চলে যেত। ঠাকুর দেখা, ঘুরে বেড়ানো, মেলায় যাওয়া, নাগরদোলা চড়া, টিনের বাক্সে চোখ লাগিয়ে সিনেমার নায়ক নায়িকা দেখা, কী আনন্দ মনে হতো গোটা একটা সিনেমা দেখে ফেলছি। সত্যি বায়োস্কোপের নেশা আমার কাটে না এখনো।

তারপর ছিল মেলায় ঘুরে রাজ্যের জিনিস কেনা। কিন্তু এত কম টাকা থাকত সব ইচ্ছে করলেই কেনা যেত না, তবে জিলিপি, নিমকি, দানাদার মিষ্টি কিনে সবার শেষে একটা বাঁশি কিনতাম। সারাক্ষণ সবার কান ঝালাফালা করে সারা রাস্তা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘরে ফিরতাম। সেই সাথে থাকতো একটা ঘড়ি ও সানগ্লাস ; লাল, নীল, হলুদ যে কোন রঙের। তারপর আসত দশমী, মায়ের চলে যাওয়ার দিন। মাকে ভাসান দেওয়া হতো ইছামতী নদীতে। সেদিন বাড়ির সবাই মিলে নদীতে নৌকা চড়া হতো। দুপুর থেকে নৌকা চড়া নিয়ে এক অনাবিল আনন্দ ধারায় স্নাত হতাম। তবে সন্ধ্যের মুখে যখন প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতাম, খুব কান্না পেত। ছোটবেলার পুজোকে ঘিরে যে কত রকম স্মৃতি জড়িয়ে আছে ! ঠাকুর ডুবিয়ে রাতে হত শান্তির জল ছিটানো। সেই জল মাথায় নিলে সারা বছর শুধু শান্তি আর শান্তি। পাড়ার সবাই প্রচন্ড মন খারাপ ও শোক নিয়ে বসতাম একসাথে জড় হয়ে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে সবাইয়ের মাথায় শান্তির জল ছিটিয়ে দিতেন। সেই জলও যদি ঠিক মতো মাথায় না পড়তো দৌড়ে গিয়ে বলতাম, ঠাকুরমশাই আমার মাথায় জল পড়েনি। উনি আম্রপল্লব ভিজিয়ে আমার গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিতেন। তখন মনে হত সব মঙ্গল আমার সাথে! ওঁম শান্তি !

শৈশবের পুজোর আনন্দ, আবেগ, অনুভূতি পুরোটা নির্ভেজাল, নিষ্পাপ। শতভাগ মন থেকে ছিল। লোক দেখানোর কিছু ছিল না। এখন পুজো আসে, পুজো যায়। অনুভবে সেই আনন্দ হিল্লোল আর দোলা দিয়ে যায় না। অনুভূতিগুলি কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে। সময় বয়স মানুষকে এভাবে পাল্টে দেয়। এক সময় যে পুজোর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম, এখন মনে হয় পুজো গেলেই বাঁচি। সবকিছু যেন কেমন লোক দেখানো ভাব। প্রতিনিয়ত একজন আরেকজনকে টপকে যাওয়ার মানসিকতা আমাদের পেয়ে বসেছে। নিজের মনের শান্তি, ভালোলাগাগুলো কোথায় উড়ে গেছে দমকা হাওয়ায়। মানুষের জীবনে সংযুক্ত হয়েছে নূতন অধ্যায় ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম নামক নানা পেজ, ওয়েব সাইট রাতারাতি মানুষকে পাল্টে রোবটে পরিণত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা সব কিছু কমে এসেছে। সব কিছুর শেষ সীমানা নেটে এসে সীমাবদ্ধ। কেমন যেন সব যান্ত্রিক। খুব কাছের মানুষকেও আর চেনা যায় না। সবাই খুব ব্যস্ত এই নেট নিয়ে। কাকে খোঁজে, কি খোঁজে কেউ জানে না। সব কিছু যেন নাগালের বাইরে। তাই মনে হয় আগের মতো করে পুজোতে ভিতর থেকে সাড়া পাই না। আর আমার কাছে পুজোর অনেক কিছু অপচয় মনে হয়। সেই টাকা দিয়ে অন্তত বছরে দশ হাজার মানুষের ঘর বানানো যেত। তাদের সারা জীবনের মাথা গোঁজার ঠাঁই হত। এতেও কিছু কম পুণ্যি অর্জন হতো না।

আর এ বছর তো ঈশ্বরই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। সারা পৃথিবীকে 'করোনা' নামক ভাইরাস স্তব্ধ করে দিয়েছে। কত মানুষ সময়ের আগে প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। সারা পৃথিবী করোনা আক্রান্ত। এই ভাইরাস কোথা থেকে এলো, কীভাবে আসলো সবজান্তা গুগলও বলতে পারেনা। এবারে মা দুর্গাও হয়তো স্বর্গ থেকে আসবেন মাস্ক পরে ছেলেমেয়েদের মাস্ক পরিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে। দশ হাতে দশ রকমের বিধি নিয়ে। কারণ পৃথিবী থেকে যদি করোনা নিয়ে স্বর্গে যান, মা দুর্গার আর রক্ষে নেই। সব দেবতারা মিলে তাকে একঘরে তো করবেনই এমনকি বহিষ্কারও করতে পারেন। তাই এবার দেবী দুর্গার শুধু অসুর নিধন করলেই চলবে না, করোনাকে বধ করে তার অগণিত সন্তানদের যেমন রক্ষা করতে হবে তেমনি নিজেকেও করোনা মুক্ত করে স্বর্গে যেতে হবে। তাই আশাবাদী, করোনাও বধ হবে সমস্ত অসুরের সাথে।

করোনা ও আম্ফান পরবর্তী সুন্দরবন

শ্রী ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

আনুমানিক ২৬০ কোটি বৎসর অতিক্রান্ত। সুদূর অতীতের সেই শুভলগ্ন থেকে অদ্যাবধি অভিযোজন আর অভিব্যক্তি'র দাক্ষিণ্যে নবতম সংযোজন এবং অবলুপ্তি কিংবা ধ্বংসের মসৃণধারা আজও অব্যাহত। সম্প্রতি কয়েক শতাব্দীর অমোচনীয় ঘটনা- প্লেগ, স্পেনীয় ফ্লু এবং কলেরা নাড়িয়ে দিয়েছিল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং উন্নত মানবজাতিকে। সঙ্গে আছে 'ক্যানসার' এবং 'এড্‌স' এর মতো মারণব্যাধি। দুরারোগ্য এমন বেশ কিছু রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তা আজও দুষ্প্রাপ্য। বিজ্ঞানের অকৃপণ দান - শিল্পোন্নয়ন, পারমাণবিক-ক্লাস্টার বোমা, মঙ্গলগ্রহ অভিযান সহ অজস্র উন্নয়নের স্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশায় মানব সমাজ বড় উদগ্রীব। ফলস্বরূপ, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে- জল, মাটি, শব্দ এবং বায়ুদূষণ অর্থাৎ এককথায় পরিবেশদূষণ।

মানুষের শরীরে জন্ম থেকেই প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধিত এই সমস্ত দূষণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শরীর ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার প্রতিরোধক্ষমতা। ফলে শরীরে প্রবেশ-করা ক্ষতিকর জীবাণু বা ভাইরাস অতি সহজে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে এরা আবার স্ব-রক্ষার্থে নিজেদের শরীরের মূল উপাদান অর্থাৎ ডি এন এ পরিবর্তন করে চিকিৎসাবিদ্যাকে ধোঁকা দিয়ে বহাল-তবিয়তে বেঁচেও থাকছে।

পরিবেশদূষণ, পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্রমবর্ধিত তাপমাত্রা এবং সর্বোপরি খাদ্যসংকটে জেরবার বিশ্বের আঙিনা জুড়ে হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করল গোত্রবহির্ভূত 'করোনা' নামক এক মারণ ভাইরাস যা কয়েক মাসের মধ্যে স্বমহিমায় 'মহামারি'র তকমা অর্জন করল। সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুভয়ের আতঙ্কে কাঁপছে ঠকঠক করে। আপাতত, প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে 'প্রতিরোধক্ষমতা' বাড়ানো এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই হলো করোনার একমাত্র ওষুধ। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, রাজা-মহারাজা-আমলা-মন্ত্রী থেকে

আমজনতার ক্ষেত্রে ভিক্ষা খাদ্যের নয় - ভিক্ষা আয়ুর। আমাদের মাতৃভূমিও স্তব্ধ দীর্ঘ দিন। করোনায় আক্রান্তদের রোগ মুক্তির সংখ্যা অবশ্যই ভালো কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাও নজর কাড়ছে।

বিপদ তো একা আসে না- দক্ষিণবঙ্গের কপালে দোসর হয়ে দেখা দিল বিধ্বংসী 'সুপার সাইক্লোন' যার আতুঁড়ঘর হলো বঙ্গোপসাগর। 'মৌসম ভবন' নিয়ন্ত্রিত থাইল্যান্ডের দেওয়া 'আম্ফান, - আমপান বা উম্পুন' নামকরণ, জন্মস্থান কিংবা আকার আয়তনে কিই বা এসে যায়- আসল পরিচয় কিন্তু তার কর্মে, তা সে সৃজনশীল সৃষ্টির মাধ্যমে হোক নয়তো বা ধ্বংসাত্মক মহিমায়। মৌসম ভবনের সতর্কবার্তার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রক্ষায় ২০মে, ২০২০ (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭) বুধবার দুপুর গড়াতেই বাড়তে শুরু করল বাতাসের গতিবেগ। অবশ্য নীল আকাশটা গোমড়ামুখো হয়েছিল একদিন আগে থেকেই। অশনি সংকেত অনুমানে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাসহ উভয় ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুর, আর বলাই বাহুল্য বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলের লবনাম্বু প্রজাতির উদ্ভিদকুল প্রহর গুণছিল অস্তিত্ব রক্ষার শঙ্কায়। সকাল থেকে আম্ফান উন্মাদনার লক্ষণ নিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থানরত মত্ত সন্তানহারা খ্যাপা দানবীর মতো ফুঁসছিল।

পূর্বাভাস বাস্তবায়িত হওয়ার আশঙ্কায় এলাকাভিত্তিক সুন্দরবনের মানুষজনকে নিরাপদে থাকার নির্দেশসহ সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীবাঁধ সংলগ্ন বাসিন্দাদের ফ্লাডসেন্টারে এবং স্থানীয় স্কুল বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধেয়ে আসা প্রলয়ঙ্কর ঝড় মাতলা, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল প্রমুখ নদী তো বটেই সঙ্গে তাদের শাখা-প্রশাখাসমূহের জলরাশিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উন্মাদ করে তুলল। ধ্বংসলীলায় মত্ত আম্ফান আর উন্মাদিনীর যোগ্যসঙ্গত- বিজয়স্তম্ভের মতো দশ-বারো ফুট উঁচু উঁচু জলস্তম্ভ একটার পর একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কালসার অজগরের মতো শুয়ে থাকা অপরিকল্পিত জোড়াতালি দেওয়া 'বালিরবাঁধ' সম নদীবাঁধের উপর। 'প্রতিরোধ অর্থহীন'-বুঝে নিজেরাই যত্রতত্র ধরাশায়ী হল নদীবাঁধ। ঝড়ের বৈকালিক তাণ্ডব চাক্ষুস করে ঘরছাড়া মানুষজনের চোখের পাতা যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য মৌনতায় জড়িয়ে ছিল অনেকটা মাদকের নেশার মতো, হয়তো বা জলও ঝরছিল শ্রাবণের ধারার মত। আশঙ্কা, একটার পর একটা ঝড় কিংবা জলস্ফীতি বাঁধভাঙ্গার ফলে ক্ষেতখামারে নোনাজলের আধিপত্য কিংবা এক চিলতে আশ্রয় হারিয়ে জীবনের চেনা ছন্দে ফিরতে না ফিরতে আবার অশনিগ্রাস। হয়তো ওঁরা বুঝেছেন পা না ভিজিয়ে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু চোখ না ভিজিয়ে জীবনের তরী বাওয়া যায় না। ওঁরা বুঝেছেন- তলানির স্তরে অবস্থান করে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজতে খুঁজতে একদিন মৃত্যুর কাছে পৌঁছে যাওয়ার নামই হয়তো জীবন।

'আট থেকে আশিকেও ফাঁসায় যুবতী নারী আর উত্তাল ভরাট বুকের নদী ভাসায় নগরকুল'- বচনের বাস্তবতা দেখল বিশেষ বিশেষ এলাকার সুন্দরবনবাসী। আম্ফানের ভয়ংকর চেহারাটা বেআব্রু হতেই মুহূর্তের মধ্যে নোনা জল এলাকাভিত্তিক খেতখামারগুলো দখল নিতে হয়ে গেল 'মেছো' ঘেরি আর সংলগ্ন এলাকার কাঁচা মাটির ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে, অ্যাসবেস্টস্ দেওয়া ছাউনিগুলো মুড়িমুড়কির মতো বাতাসে উড়লো- ভাঙলো খোলামকুচির আকৃতিতে। ঝুলে পড়া বর্ষণপ্লুত মেঘলা আকাশের নীচে নিরাশ্রয় মানুষগুলো ভাসল আস্থাহীনতার অতলান্তে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়, আয়লা, বুলবুল না আম্ফান- এই ত্রয়ী'র মধ্যে বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের স্থানে অবস্থান করছে কোন 'ঝড়'। আসল ব্যাপারটা হল, ১) বিধ্বংসী ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতির ব্যাপকতা নির্ভর করে প্রত্যেকটি দেশের নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার 'নদীবাঁধ' স্থাপত্যের উপর। বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার শক্তপোক্ত 'জীবনরেখা' যদি তৈরি হয় তাহলে ভাঙার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। ২) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- জোয়ার এবং ভাটা। আমরা জানি, দিন রাত অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় নদী-খালের বুকে দু'বার জোয়ার এবং ভাটা হয়। এর মধ্যে আবার কোটাল এবং মরানী'র জলস্ফীতির

ব্যাপার লক্ষণীয়। মরানী অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী অবধি নদীখালে জোয়ার এবং ভাটার প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু 'কোটাল' অর্থাৎ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার দু'দিন আগে থেকে পরের চার দিন জোয়ার-ভাটার গতি হয় তীব্র সঙ্গে জলস্ফীতিতে বুক হয় ভরাট- যা ছুঁয়ে যায় 'জীবনরেখা'র বক্ষাংশ বা তদুর্ধ্ব অবধি। এছাড়া, ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে চাঁদ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করার সময় অনুসুর পথে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসায় সাগরের জলস্ফীতি অত্যন্ত বেশি এবং ভাটার জল অনেকটা নীচে অবস্থান করে।

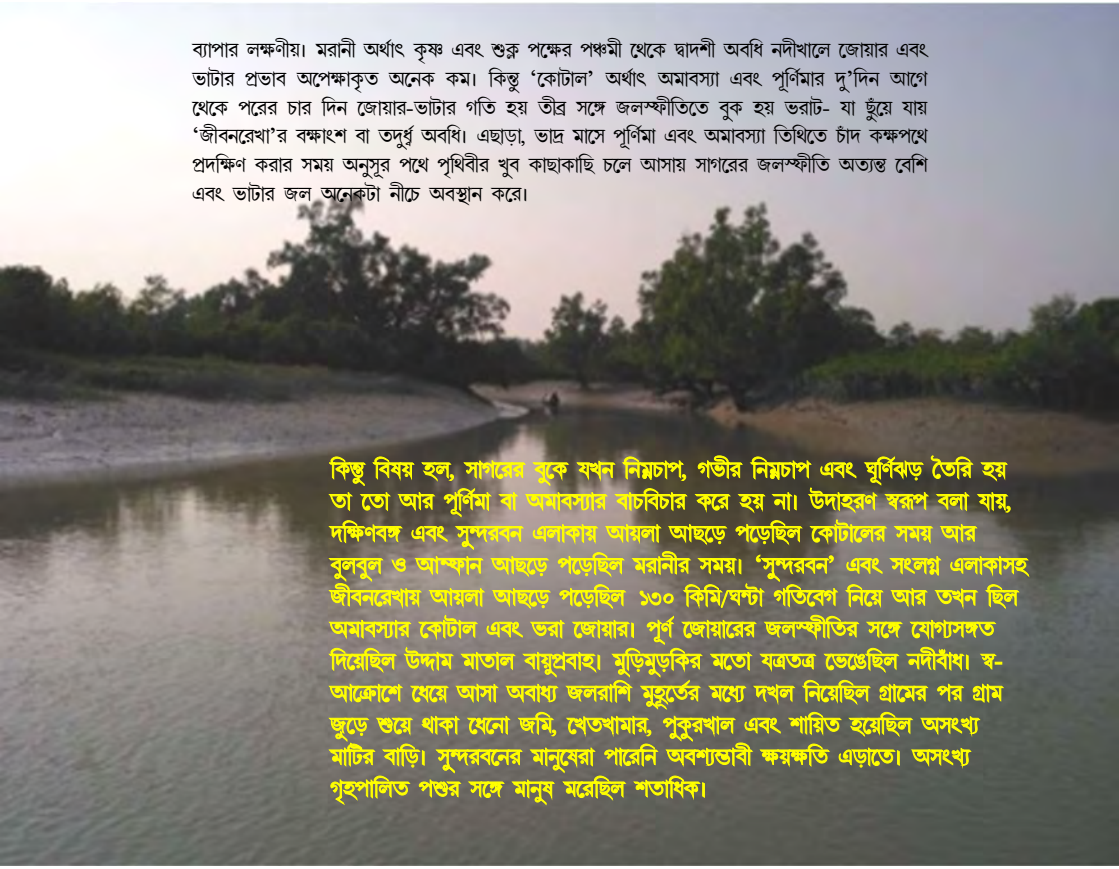

কিন্তু বিষয় হল, সাগরের বুকে যখন নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তা তো আর পূর্ণিমা বা অমাবস্যার বাচবিচার করে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণবঙ্গ এবং সুন্দরবন এলাকায় আয়লা আছড়ে পড়েছিল কোটালের সময় আর বুলবুল ও আম্ফান আছড়ে পড়েছিল মরানীর সময়। 'সুন্দরবন' এবং সংলগ্ন এলাকাসহ জীবনরেখায় আয়লা আছড়ে পড়েছিল ১৩০ কিমি/ঘন্টা গতিবেগ নিয়ে আর তখন ছিল অমাবস্যার কোটাল এবং ভরা জোয়ার। পূর্ণ জোয়ারের জলস্ফীতির সঙ্গে যোগ্যসঙ্গত দিয়েছিল উদ্দাম মাতাল বায়ুপ্রবাহ। মুড়িমুড়কির মতো যত্রতত্র ভেঙেছিল নদীবাঁধ। স্ব-আক্রোশে ধেয়ে আসা অবাধ্য জলরাশি মুহূর্তের মধ্যে দখল নিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে শুয়ে থাকা ধেনো জমি, খেতখামার, পুকুরখাল এবং শায়িত হয়েছিল অসংখ্য মাটির বাড়ি। সুন্দরবনের মানুষেরা পারেনি অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে। অসংখ্য গৃহপালিত পশুর সঙ্গে মানুষ মরেছিল শতাধিক।

পক্ষান্তরে, বুলবুল ঝড় সমপরিমাণ গতিতে উপকূলে আছড়ে পড়লেও ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি সুন্দরবনী জীবনে। কিন্তু হলেও মরানী'র শেষ লগ্ন, 'আম্ফান' তো ঝাঁপিয়েছিল অর্জিত 'প্রতিশ্রুতি'র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। শতাব্দী প্রাচীন রেকর্ড ভাঙতে মরিয়া আম্ফান ১৬০, ১৭০ কখনও বা দমকায় গতি বাড়িয়ে ঘূর্ণিতে রূপান্তরিত হয়ে ২০০ কিমি/ঘন্টায় দুরন্ত গতিতে আছড়ে পড়েছিল কলকাতা এবং উভয় ২৪ পরগণা সহ সাগরমোহনায় চিহ্নিত 'সুন্দরবন অঞ্চল' এর বিস্তীর্ণ অংশে। নদীবক্ষে মরানী'র ভাটা- প্রত্যাশা মতো জলস্তর ছিল নদীবাঁধের নিয়ন্ত্রণে। আম্ফানের পাতা মুষ্টিবদ্ধ ফাঁদে পা দিলেও 'জলস্ফীতি' নদীবাঁধকে কিন্তু যত্রতত্র ভাঙতে পারেনি। অনেকাংশে ভেঙেছে- ক্ষতিও হয়েছে বেহিসাবি। আম্ফান যে গতিতে আছড়ে পড়েছিল তাতে প্রতিরোধ ছিল অর্থহীন। গাছপালা, ঘরবাড়ি ভাঙা তো বটেই, সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে শতাব্দী শ্রেষ্ঠ শিরোপার তকমা যে অর্জন করেছে তা হলপ করে বলা যায়। বেঁচে যাওয়া উদ্ভিদকুলের পাংশুটে ধূসর পত্ররাজি, ভাঙা ঘরবাড়ি, তছনছ হওয়া

নদীবাঁধ এবং বিপর্যস্ততার নিরিখে আয়লা, বুলবুলের কঙ্কালদ্বয় মুখ লুকিয়েছে রাজাধিরাজ 'আম্ফান' মহাশয়ের পদতলে।

ঘটনাপ্রবাহে যা হয় আর কি? রাজ্যস্তরে চলল জরুরী বৈঠক- বিতরণ হল এবং হচ্ছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অপ্রতুল হলেও ত্রাণসামগ্রী। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (আমরাও আমাদের BHSAA-র তরফ থেকে সান্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহযোগিতায় সাহেবখালি অঞ্চলে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় ব্রতী হয়েছিলাম।) নিরলস প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় নিরন্ন সুন্দরবনবাসী মানুষের পাশে। কিন্তু বাদ সাধছে ঐ প্রাণঘাতী করোনার উদ্ধত ছোবল লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব আর অনাহূত মৃত্যুভয়।

তবুও জীবন বাজী রেখে কোনো গ্রুপ পদব্রজে, কেউ কেউ মোটরভ্যানে চড়ে সুন্দরবনের দুর্গম পথ পেরিয়ে তো আবার অনেকে কাছেপিঠে থাকা জেলে নৌকায় চেপে রিমঝিম বৃষ্টিতে ভিজে মাতলা-বিদ্যাধরীতে পাড়ি জমিয়ে ঘন্টা কয়েকের যাত্রা শেষে পৌঁছে দিচ্ছেন ত্রাণসামগ্রী। ঝড়ে বিধ্বস্ত নদীবাঁধভাঙা অবহেলিত সুন্দরবনবাসী অনুধাবন করেছেন- 'অবহেলা বুঝতে ভাষার প্রয়োজন হয়না, ব্যবহারটাই যথেষ্ট। তা সে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা বা শহরের ধোপধুরস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি কিংবা অপরিচিত বা পরিচিত 'মানুষ' যিনি বা যাঁরা নিজেদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বলে বড়াই করেন - তাদের আচার-আচরণেই তা প্রকাশ পায়'।

পরিকল্পনা মাফিক নদীবাঁধ নির্মাণ নিয়ে অবহেলা, ক্রমাগত তাচ্ছিল্য এবং কিছু কিছু বাস্তবতার পাহাড়প্রমাণ অভিমান - বিস্তীর্ণ অন্ধকারবৃত্তে ক্ষীণতম আলোকআভায় বাস-করা সুন্দরবনবাসীরা দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছে, খুব কাছের হয়েও কেমন যেন পর পর মনে হয়। বিশ্বাসভঙ্গের শিকার হয়ে একটি দিন বাঁচার পর, পরের দিনটার জন্য জঙ্গলাভ্যন্তরে সৌতা-ভারানির অন্ধকার সুড়ঙ্গে মাছ-কাঁকড়া ধরে দুবেলা না হলেও একবেলা খেয়ে বাঁচে, সময় সময় বাঘের হানায় মৃত্যুবরণ করে সহাস্যে। জেনে বুঝে বীতশ্রদ্ধ বঞ্চিত জীবনগুলো বাঁচার জন্য 'আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে' নিজেদের মতো করে নিজেরাই তৈরি করেছে ভাঙা-গড়ার স্বপ্ননীড়।

> ''মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
> মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।''
>
> -- শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

ছবি সৌজন্যেঃ লেখক

কোভিড ত্রাণ বিতরণ (২০২০)

সুন্দরবনে আম্ফান-তাণ্ডবে দুর্গত এলাকায় BHSAA কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ (২০২০)

about the organization

awards

BY BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

BHSAA EXCELLENCE AWARD – 2019

Conferred on 14 Sep, 2019 to the toppers within Basirhat Municipality

	Higher Secondary Examination 2019	School	Certificate & Cash Prize
1	Swarnendu Sarkar	Basirhat Town High School	Rs. 4,000/-
2	Amritanshu De	Basirhat Town High School	Rs. 4,000/-
3	Arkadip Majumder	Basirhat High School	Rs. 4,000/-

	Madhyamik Pariksha 2019	School	Certificate & Cash Prize
1	Kaustav Dey	Basirhat High School	Rs. 4,000/-
2	Ritabrata Roy	Basirhat High School	Rs. 4,000/-
3	Ishani Saha	Basirhat P.C.M.Girls' High School	Rs. 4,000/-

BHSAA EXCELLENCE AWARD – 2018

Conferred on 19 Jan, 2019 to the toppers within Basirhat Municipality

	Higher Secondary Examination 2018	School	Certificate & Cash Prize
1	Aditi Das	Basirhat Town High School	Rs. 3,000/-
2	Dipjyoti Chowdhury	Basirhat High School	Rs. 3,000/-
3	Katha Haldar	Basirhat H.M.D.Girls' High School	Rs. 3,000/-

	Madhyamik Pariksha 2018	School	Certificate & Cash Prize
1	Srijita Mondal	Basirhat H.M.D.Girls' High School	Rs. 3,000/-
2	Atreyee Basu	Basirhat H.M.D. Girls' High School	Rs. 3,000/-
3	Rouhin Chakraborty	Basirhat High School	Rs. 3,000/-

DURGADAS BASU MEMORIAL AWARD – 2019

For the Highest Marks obtained by a student of Basirhat High School in the Language Group in Higher Secondary Examination (Total marks in Bengali & English)

Certificate & Cash Prize Rs. 4,000/- to Shri Arkadip Majumder

(Instituted in the memory of an iconic teacher of Basirhat High School by his student, Dr. Suptendu P. Biswas, in collaboration with Basirhat High School Alumni Association)

JYOTIRINDRANATH DAS MEMORIAL MERIT-CUM-MEANS AWARD – 2019

To a student of Basirhat High School for Special Performance in Higher Secondary Examination 2019

Certificate & Cash Prize Rs. 5,000/- to Shri Srijan Kundu

(Instituted in the memory of the beloved former Headmaster of Basirhat High School by his family in collaboration with Basirhat High School Alumni Association)

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের'- জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান (২০১৯)

AWARD FOR ESSAY COMPETITION – 2019

Among students of Basirhat High School
(Books & Memento to each Awardee)

For Bengali Essays

Class VI to VIII
1st: Shri Atreya Mondal (VIII)
2nd: Shri Diparghya De (VII)

Class IX to XII
1st: Shri Pushan Banerjee (IX)
2nd: Shri Sabir Islam Mondal (IX)

For English Essays

Class IX to XII
1st: Shri Rouhin Chakraborty (XII)
2nd: Shri Debanshu Ghosh (X)

AWARD FOR POSTER DESIGN COMPETITION – 2019

Among students of Basirhat High School
(Books & Memento to each Awardee)

1st: Shri Hritwik Sarkar (VII)
2nd: Shri Anshuman Banerjee (V)

AWARD FOR SPELL-BEE COMPETITION– 2019

Among students of Basirhat Sub-division
(Books & Memento to each Awardee)

Position	Names	School
1st	Shri Ritabrata Roy (X) Shri Arghya Das (X)	Taki R.K.Mission High School
2nd	Shri Biswarup Gharami (IX) Shri Swastik Mondal (IX)	Taki R.K.Mission High School
3rd	Miss Shinjini Mitra (X) Miss Arunima Biswas (X)	Bhabla Lady Mukherjee Girls' High School
4th	Miss Suchetana Roy (VII) Miss Munaija Parveen (VII)	Basirhat P.C.M. Girls' High School

BHSAA -র প্রথম সাম্মানিক সদস্য পদ দেওয়া হল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী সুভাষ কুণ্ডু মহাশয়কে

বার্ষিক সাধারণ সভায় (২০১৯-২০) সদস্যরা

বার্ষিক সাধারণ সভায় (২০১৯-২০) BHSAA Website প্রকাশ

BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION
(under the Registered Charitable Trust)

BOARD OF TRUSTEES

S. No.	Name	Designation
1	Shri Amalendu Prasad Roy	Chairman of the Trust
2	Shri Anjan Kumar Basu	Trustee Designate
3	Shri Achintya Kr Das	Treasurer of the Trust
4	Shri Mihir Baran Basu	Trustee Designate
5	Dr. Tanmay Mukhopadhyay	Trustee
6	Dr. Suptendu P. Biswas	Secretary of the Trust
7	Dr. Shahedal Bari	Trustee
8	Dr. Archita Ghosh	Trustee
9	Dr. Arghya Majumder	Trustee Designate

EXECUTIVE COMMITTEE

S. No.	Name	Designation
1	Shri Debajyoti Ray	President
2	Shri Kalidas Majumdar	Vice President
3	Shri Shyamal Kr Datta	Vice President
4	Shri Gobinda Kr Mullick	Vice President
5	Shri Biswamohan Das	Vice President
6	Shri Jayanta Bhattacharya	General Secretary
7	Dr. Tapan Kr Sarathi	Jt. Secretary
8	Shri Subhadip Biswas	Jt. Secretary
9	Shri Indranil Biswas	Jt. Secretary
10	Shri Gaurab Das	Treasurer
11	Shri Gautam Bhattacharya	Jt. Treasurer
12	Shri Tapash Kr Chakraborty	Member
13	Shri Sekhar Palit	Member
14	Shri Bishnupada Sarkar	Member
15	Shri Tapas Kr Basu (Sekhar)	Member
16	Shri Subrata Banerjee	Member
17	Shri Kaushik Aich	Member
18	Dr. Saptarshi Banerjee	Member
19	Shri Somik Chakraborty	Member
20	Shri Avra Majumder	Member
21	Shri Achintya Kr Das	Trust Representative
22	Dr. Archita Ghosh	Trust Representative

SUB-COMMITTEE MEMBERS

S. No.	Name	S. No.	Name
1	Shri Kalidas Majumdar	2	Shri Biswamohan Das
3	Shri Jayanta Bhattacharya	4	Shri Tapash Kr Chakraborty
5	Shri Murari Chakraborty	6	Shri Tapan Kr Sarkar
7	Shri Sekhar Palit	8	Shri Bishnupada Sarkar
9	Shri Tapas Kr Basu (Sekhar)	10	Shri Subrata Banerjee
11	Shri Indranil Biswas	12	Shri Somik Chakraborty

BHSAA MEMBERS

(in order of school-leaving year)

S.No.		Name	Year	Exam
1	Shri	AMALENDU PRASAD ROY	1955	S.F.
2	Shri	AMARENDRA NATH DAS	1955	S.F.
3	Shri	MALAY KUMAR BASU	1956	S.F.
4	Shri	KALIDAS MAJUMDAR	1958	S.F.
5	Shri	PRADIP KR BANERJEE	1960	H.S.
6	Shri	SUBHAS CHANDRA KUNDU	1962	H.S.
7	Shri	DEBAJYOTI RAY	1963	H.S.
8	Shri	LAKSHMAN CH DE	1963	H.S.
9	Shri	SHYAMAL KUMAR DATTA	1964	H.S.
10	Shri	NABARUN RAY	1964	H.S.
11	Shri	SUBAL KUMAR DAS	1967	H.S.
12	Shri	ACHINTYA KUMAR DAS	1968	H.S.
13	Shri	ANJAN KUMAR BASU	1968	H.S.
14	Shri	MRINMOY DAS	1970	H.S.
15	Shri	JAPENDRA NATH DAS	1970	H.S.
16	Shri	SUSANTA KR BHATTACHARYA	1971	H.S.
17	Shri	TAPASH KUMAR CHAKRABORTY	1972	H.S.
18	Shri	GOBINDA KUMAR MULLICK	1972	H.S.
19	Shri	MIHIR BARAN BASU	1972	H.S.
20	Shri	ARUP MAJUMDAR	1972	H.S.
21	Dr	DINABANDHU MANDAL	1972	H.S.
22	Shri	DEBU BANERJEE	1972	H.S.
23	Shri	CHANDIDAS GANGOPADHYAY	1972	H.S.
24	Shri	RABINDRANATH GHOSH	1972	H.S.
25	Shri	DEBDAS DATTA	1972	H.S.
26	Shri	BISWAMOHAN DAS	1973	H.S.
27	Shri	JAYANTA BHATTACHARYA	1973	H.S.
28	Shri	MURARI CHAKRABORTY	1973	H.S.
29	Shri	AMALENDU CHAKRABORTY	1973	H.S.
30	Shri	SAMARES MITRA	1973	H.S.
31	Dr	NIKHIL KUMAR SARKAR	1974	H.S.

32	Shri	MONOTOSH BISWAS	1974	H.S.
33	Shri	SUKHENDU SARKAR	1974	H.S.
34	Shri	TAPAN KUMAR SARKAR	1975	H.S.
35	Shri	SEKHAR PALIT	1975	H.S.
36	Shri	BISHNU PADA SARKAR	1976	H.S.
37	Shri	JASHENDRA NATH DAS	1976	H.S.
38	Shri	PRANAB MONDAL	1976	H.S.
39	Shri	SUBHASISH DAS	1976	H.S.
40	Shri	BIDYUT P BHATTACHARYA	1976	H.S.
41	Shri	SANKAR BASU	1976	H.S.
42	Shri	TAPAS KUMAR BASU	1978	H.S.
43	Dr	TAPAN KUMAR SARATHI	1978	H.S.
44	Shri	JAYANTA GHATAK	1978	H.S.
45	Shri	DIBYENDU SARKAR	1979	H.S.
46	Shri	SUSANTA ROY ADHIKARI	1979	H.S.
47	Shri	JAYABRATA GHOSH	1980	H.S.
48	Dr	SUSOBHAN SENGUPTA	1981	H.S.
49	Shri	TAPAS PAL	1982	H.S.
50	Shri	SAUGATA BHATTACHARYYA	1983	M.P.
51	Shri	GAUTAM BHATTACHARYA	1983	H.S.
52	Shri	ARUNAVA DAS	1983	H.S.
53	Shri	RAHUL SARKAR	1983	H.S.
54	Mrs	CHHANDA HALDAR	1983	H.S.
55	Shri	TAPAS KUMAR KANJILAL	1983	H.S.
56	Shri	DIPANKAR SAHA	1983	H.S.
57	Dr	MANAS BASU	1983	H.S.
58	Shri	SIDDHARTHA KR BISWAS	1983	H.S.
59	Dr	MONOJIT MONDAL	1983	H.S.
60	Shri	MRINMOY SAMIRAN NANDY	1984	H.S.
61	Shri	DEBASISH BANERJEE	1984	H.S.
62	Shri	MRINAL KANTI MALLICK	1984	M.P.
63	Shri	TANAY BISWAS	1984	M.P.
64	Shri	AMITABHA GHOSH	1984	H.S.
65	Shri	TARUN CHATTOPADHYAY	1984	H.S.
66	Shri	ARUN KR GHOSH	1984	H.S.

67	Dr	TANMOY MUKHOPADHYAY	1985	H.S.
68	Shri	SUBRATA BANERJEE	1985	H.S.
69	Mrs	ARUNIMA GHOSH (BASU)	1985	H.S.
70	Shri	SUBRATA BASU	1985	H.S.
71	Shri	UTTAM DE	1985	H.S.
72	Shri	SUBHASISH GHOSH	1986	H.S.
73	Dr	SUPTENDU P. BISWAS	1986	H.S.
74	Shri	GAURAB DAS	1986	H.S.
75	Shri	TANMOY MONDAL	1986	H.S.
76	Mrs	MANIMEKHALA NANDY	1986	H.S.
77	Shri	GOUTAM ROY	1986	H.S.
78	Shri	SUJAY KR GHOSH	1986	H.S.
79	Shri	BISWAJIT BISWAS	1987	H.S.
80	Dr	AMITAVA MITRA	1987	H.S.
81	Dr	SAHEDAL BARI	1987	H.S.
82	Shri	MRINMOY CHAKRABORTY	1988	H.S.
83	Mrs	MUNMUN MONDAL	1989	H.S.
84	Shri	KAUSHIK AICH	1989	H.S.
85	Dr	ARCHITA GHOSH	1990	H.S.
86	Shri	ADITINANDAN CHANDRA	1990	H.S.
87	Dr	MRITYUNJOY MALLICK	1990	H.S.
88	Shri	SUVOJIT ROYCHOWDHURY	1990	H.S.
89	Dr	ARGHYA MAJUMDER	1991	H.S.
90	Shri	SANKAR CHAKRABORTY	1991	H.S.
91	Shri	ASISH DAS	1991	H.S.
92	Shri	DIPAK PAL	1991	M.P.
93	Shri	ANUP BANERJEE	1991	H.S.
94	Shri	AVIJIT CHOWDHURY	1992	H.S.
95	Shri	SUBHADIP BISWAS	1994	H.S.
96	Shri	INDRADEEP BHATTACHARYYA	1994	H.S.
97	Shri	ARINDAM GHOSH	1995	H.S.
98	Dr	SUBRATA BISWAS	1995	H.S.
99	Dr	DEBASHIS PAL	1996	H.S.
100	Shri	BISWAJIT BHATTACHARYA	1996	H.S.
101	Dr	MAHUYA SARKAR	1997	H.S.

102	Dr	PARTHA PRATIM MONDAL	1997	H.S.
103	Shri	HRISIKESH SARKAR	1997	H.S.
104	Shri	MITHUN CHAKRABORTY	1997	H.S.
105	Shri	RASHIDAL BARI	1998	H.S.
106	Shri	ABHIJIT BAR	1998	H.S.
107	Shri	INDRANIL BISWAS	1999	H.S.
108	Shri	SOMIK CHAKRABORTY	1999	H.S.
109	Dr	SAPTARSHI BANERJEE	1999	H.S.
110	Shri	BISWANATH DEY	1999	H.S.
111	Shri	AVRA MAZUMDER	2000	H.S.
112	Shri	BISWAJIT GHOSH	2000	H.S.
113	Shri	BISWAJIT MANDAL	2000	M.P.
114	Shri	KOUSIK DAS	2001	H.S.
115	Dr	SOURYA BANERJEE	2001	H.S.
116	Shri	DEBASIS HORE	2002	H.S.
117	Shri	SUBRATA DEY	2002	H.S.
118	Shri	ARUN KIRTTUNIYA	2004	H.S.
119	Shri	KAUSHIK MONDAL	2004	H.S.
120	Shri	SNEHAMAY MONDAL	2005	H.S.
121	Shri	SANJIB ROYCHOWDHURY	2005	H.S.
122	Shri	JAYANTA DUTTA	2005	H.S.
123	Shri	ABHISHEK DUTTA	2006	H.S.
124	Dr	SUBHANKAR CHAKRABORTY	2007	H.S.
125	Shri	ATANU BASU	2007	H.S.
126	Dr	SIDDHARTHA SARKAR	2007	H.S.
127	Shri	TIYAS KUMAR SARATHI	2008	H.S.
128	Dr	ANKUR SARDAR	2008	H.S.
129	Shri	ARANI DAS	2009	H.S.
130	Shri	DHRITIMAN SARKAR	2009	H.S.
131	Shri	SUMIT DEY	2012	H.S.

BHSAA ASSOCIATE MEMBERS

1	Shri	SINCHAN BANDYOPADHYAY
2	Shri	SAROJ KR MAITI
3	Shri	MANTU HALDER
4	Mrs	ITI ROY
5	Mrs	JUTHIKA MONDAL
6	Mrs	RUBINA PARVIN
7	Shri	PANKOJ BISWAS
8	Shri	PRADYUT MONDAL
9	Shri	JAYDIP MONDAL
10	Shri	SUSANTA BISWAS
11	Shri	GOUR CH SADHU
12	Shri	ASIT KR KABIRAJ
13	Miss	RUBI BHATTACHARYYA
14	Shri	BISWAJIT MISTRI
15	Shri	MIHIR KR DAS
16	Shri	DIPANKAR NASKAR
17	Mrs	KAKALI DAS
18	Shri	SOUMEN MONDAL
19	Shri	MADHURAM MURMU
20	Miss	SAMARPITA GANGULY
21	Shri	PRADIP DAS
22	Mrs	SHIKHA MANDI
23	Shri	PRAFULLA DHAL
24	Miss	MAHUYA GHOSH
25	Shri	RANJIT KR MUKHERJEE
26	Shri	DIPANKAR DAS
27	Shri	JAYANTA GHOSH
28	Shri	AMARENDRANATH DATTA
29	Shri	SUDHIR KR SARKAR
30	Miss	SHAMPA DE
31	Shri	PRADIP DHAL
32	Shri	SURENDRA KUMAR DHAL

WITH BEST WISHES FROM

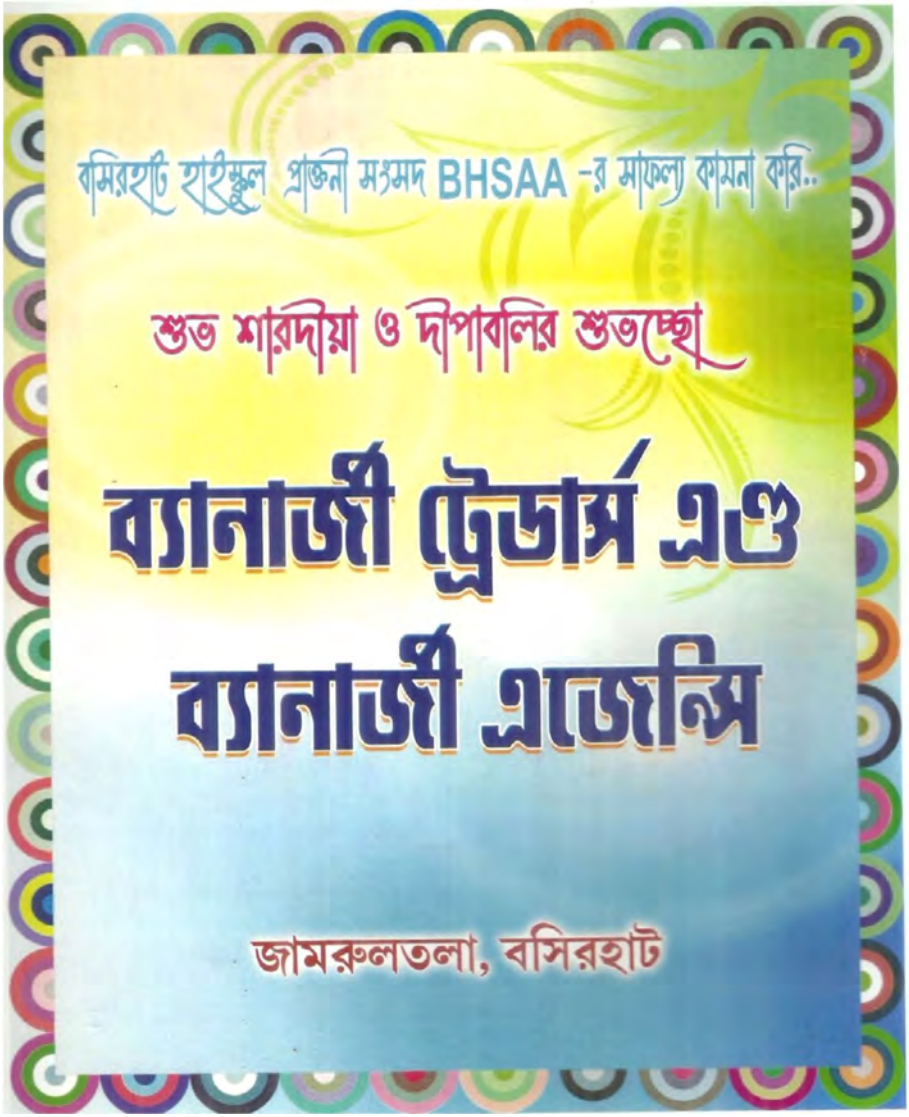
বসিরহাট হাইস্কুল প্রাক্তনী সংসদ BHSAA -র সাফল্য কামনা করি..
শুভ শারদীয়া ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
ব্যানার্জী ট্রেডার্স এণ্ড
ব্যানার্জী এজেন্সি
জামরুলতলা, বসিরহাট

বসিরহাট হাইস্কুল প্রাক্তনী সংসদ BHSAA -র সাফল্য কামনা করি..

বিপাশা ব্রিক ফিল্ড

উন্নতমানের ইটের
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

গ্রাম ঃ- ধলতিথা
পো ঃ- ধলতিথা
জেলিয়াপাড়া, বসিরহাট

With best Compliments from...

BMR

Courier & Logistics

LED VAN

B.M.R. ENTERPRISES

REGISTERED Office: 2/C, BADAN ROY LANE, KOLKATA - 700010
BRANCH Office: OFFICE NO. 1, MIDLAND PARK, 1ST FLOOR
N,P,6, NAYAPATTY, KOLKATA - 700102
TEL NO: +91 9830055270 / +91 9748571999
MAIL: bmr.enterprises2017@gmail.com

With best Compliments from...
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION
সম্পূর্ন সু স্বাস্থ্য পরিষেবা
একই ছাদের নিচে
সুপ্রীম
হেলথ কেয়ার
অন্যান্য ডায়াগনোস্টিক
পরিষেবা
ডিজিটাল এক্স-রে
ডেন্টাল এক্স-রে
আল্ট্রাসোনোগ্রাফি
ইকোকার্ডিওগ্রাফি
কালার ডপলার
টি.এম.টি
হল্টার মনিটর
ই.ই.জি * ই.এম.জি
এন.সি.ভি * বেরা
ভিডিও এণ্ডোস্কোপি
ভিডিও ক্লোনোস্কোপি
মাল্টি স্লাইস
স্পাইরাল
সিটি স্ক্যান
বসিরহাট রেজিস্ট্রী অফিস মোড়
Help Line : (03217) 267 444
9434316317 / 8373091380

WITH BEST WISHES FROM

WITH BEST WISHES FROM

TARUN KOLEY

GOVERNMENT CONTRACTOR
& ORDER SUPPLIER

PARBATIPUR : TAMLUK
PURBA MEDINIPUR

* * *

WITH BEST WISHES FROM-

TAPAS SANTRA

REGD. GOVT. CONTRACTOR
& GENERAL ORDER SUPPLIERS

ALINAN, PURBA MEDINIPUR
PIN – 721137
MOB: 9732784906

* * *

WITH BEST WISHES FROM

WITH BEST WISHES FROM:

J.D.J. ENTERPRISE

(A Unit of JDJ Traders Pvt. Ltd.)

1/1A VANSITTART ROW (3RD FLOOR), KOLKATA- 700001.
Phone: 40073630 | Tel/Fax : 22488263
E-Mail: saurabhsaraogi2001@yahoo.co.in
Manufacturers & Suppliers of:-

Water Treatment Plants and Mobile Treatment Units.
Pipe Fittings, A.C. pressure Pipes, C.I.D.Joints, Iron & Arsenic Removal lants
M.S.Round, Rubber Gasket and Pig Lead etc.

WITH BEST WISHES FROM

বসিরহাট পৌরসভা

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা ।

বসিরহাটের মানুষের কাছে সুখবর ঃ—

- আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বসিরহাটবাসীর টাউনহল এবং মাতৃসদন-কে আমরা নতুনরূপে বসিরহাটের মানুষের কাছে তুলে দেব ।
- ভ্যাবলা জিরাকপুর বাজারের দ্বিতলের কাজও সম্পূর্ণ হচ্ছে ।

শ্রী তপন কুমার সরকার
চেয়ারপার্সন
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
বসিরহাট পৌরসভা ।

BEST WISHES FROM

BHSAA

BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

Under Registered Charitable Trust